২৮ নভেম্বর ১৯৯০ ☐ আনন্দবাজার পত্রিকা ☐ সাত টাকা

আনন্দমেলা

☐ সেরাদের চ্যালেঞ্জ জানাবেন বুরেল
☐ রেফারিদের রাজত্ব কি শেষ হতে চলেছে
☐ এখন হোলিফিল্ডই সেরা
☐ হেনসের রঙিন পোস্টার

- আশাপূর্ণা দেবীর গল্প
- লীলা মজুমদারের উপন্যাস
- গতি-প্রযুক্তির নেপথ্যে
- সবচেয়ে ছোট পাখি

দুঃসাহসিক অন্তর্ধান

দুর্ভেদ্য কারাগার ভেঙে যুদ্ধবন্দিদের উধাও হওয়ার রোমহর্ষক কাহিনী

অতলান্তিক মহাসাগরের দ্বীপ থেকে কীভাবে পালিয়েছিলেন 'প্যাপিলন'

স্পার্টাকাস ও অন্যান্য বিপ্লবী মুক্তিযোদ্ধার রহস্যজনক অন্তর্ধানের ইতিহাস

সতর্ক প্রহরা এড়িয়ে কীভাবে পালিয়ে গিয়েছিলেন চার্চিল এবং ডি ভ্যালেরা

পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি দিয়েছেন - নীলাচল দা

স্ক্যান করেছেন - নীলাচল দা

এডিট করেছেন - অপ্তিমাস

একটি আবেদন

আপনাদের কারোর কাছে যদি কোন পত্রপত্রিকার বিশেষ সংখ্যা থাকে এবং আপনি সেটা আমাদের স্ক্যান করতে দিতে চান কিংবা আপনি স্ক্যান করে দিতে চান তাহলে শীঘ্রই নিচের ইমেল এ যোগাযোগ করুন

dhulokhela@gmail.com

optifmcybertron@gmail.com

এসে গেল

একেবারে নতুন

'ফ্রুট স্যালাড আহার'

ফ্যারেক্স-ফ্রুট্স-এ রয়েছে গমদানার ও দুধের পুষ্টির
সঙ্গে আগেই-পাক করা রসালো স্বাদের আপেল,
আম আর কলার অপূর্ব সমন্বয়।

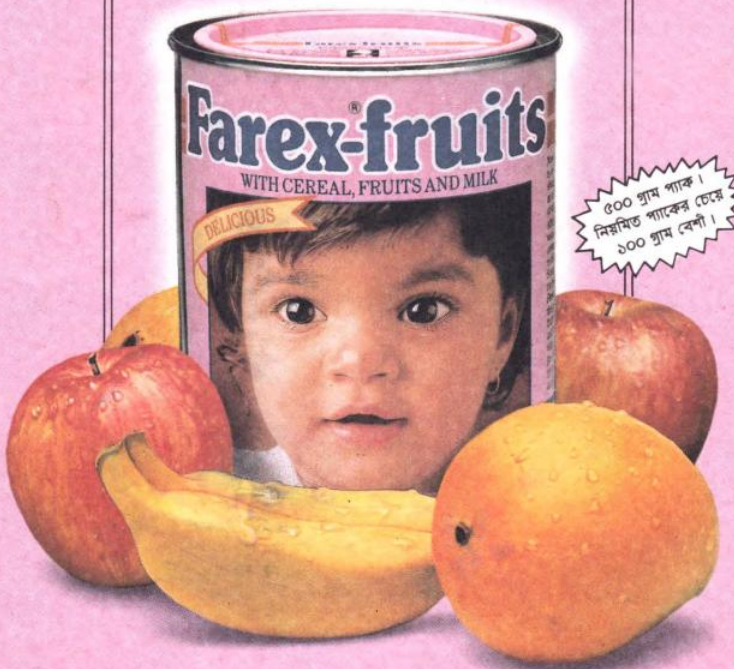

৫০০ গ্রাম প্যাক।
নিয়মিত প্যাকের চেয়ে
১০০ গ্রাম বেশী।

ফ্যারেক্স-ফ্রুট্স

বেড়ে ওঠার স্বাদভরা উপায়!

সবই দোকানে
একই সাশ্রয়কর দামে পাবেন।

Gx/247.90 Bn R

১১ অগ্রহায়ণ ১৩৯৭ □ ২৮ নভেম্বর ১৯৯০ □ ১৬ বর্ষ ১৬ সংখ্যা

আনন্দমেলা

■ সম্পূর্ণ উপন্যাস (শেষাংশ) ■

খোঁজা লীলা মজুমদার ৫৪

■ গল্প ■

হিতৈষী আশাপূর্ণা দেবী ২৪

ছবি ও তিন দল সমীর ঘোষ ৩৪

■ ধারাবাহিক উপন্যাস ■

কালাপাহাড় সমরেশ মজুমদার ৬৭

সোনার গণপতি হিরের চোখ ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায় ৭৫

■ প্রচ্ছদকাহিনী ■

দুঃসাহসিক অন্তর্ধান সুপ্রতিম সরকার ১২

■ প্রযুক্তিবিজ্ঞান ■

গতি-প্রযুক্তির নেপথ্যে কৌশিক মুখোপাধ্যায় ৬

■ কমিক্স ■

টারজান ৩১, রোভার্সের রয় ৫১, গাবলু ৫৩, টিনটিন ৭১, ব্যাটম্যান ৭৩

■ টাকাকড়ি ■

প্রাক-মৌর্য ভারতের···ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ৩০

■ পক্ষিবিজ্ঞান ■

সবচেয়ে ছোট পাখি পৌলমী সেনগুপ্ত ৩২

■ কেরিয়ার গাইড ■

অডিট ও অ্যাকাউন্টস অফিসার···অমর দাশ ৩৮

■ কবিতা ■

রামাধীন আশিস সান্যাল ৫৮

■ খেলাধুলো ■

কঠিন পরীক্ষায় হেন্স তমাল রায় ৪০

সেরাদের চ্যালেঞ্জ জানাবেন বুরেল সমীরণ সেন ৪৪

এখন হোলিফিল্ডই সেরা কাজল চক্রবর্তী ৪৬

পেনাল্টি বাঁচানোয় সেরা···প্রবীর বসু ৪৭

রেফারিদের রাজত্ব কি শেষ···সুজিত রায় ৪৮

খেলার খবর ৪৯

রঙিন পোস্টার : ডেসমন্ড হেন্স ৪১

■ নিয়মিত বিভাগ ■

চিঠিচাপাটি ৫, বিজ্ঞান : যেখানে যা হচ্ছে ১০, কিওকুশিন ক্যারাটের ক্লাস ৫০, আকাশে ওড়ার কথা ৬৪, শব্দসন্ধান ৬৬, আঁকিবুকি ৭৬, হাসিখুশি ৭৬, কুইজ ৭৮, বইয়ের খবর ৮১, নানারকম ৮২

■ প্রচ্ছদ ■

সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

সহকারী সম্পাদক □ দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্পাদকীয় বিভাগ □ সিদ্ধেশ্বরনাথ ভার্মা, সাধনা মুখোপাধ্যায়, শ্যামলকান্তি দাশ, রতনচন্দ্র ঘাটী, বাদলকুমার ঘোষ, বিমলকুমার পাল

শিল্প নির্দেশক □ অমিয় ভট্টাচার্য

সহযোগী □ অসিত পাল, প্রবীর সেন

আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেডের পক্ষে বিজিৎকুমার বসু কর্তৃক ৬ ও ৯ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০০১ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। অস্থায়ী সম্পাদক অভীক সরকার।

দাম সাত টাকা। বিমান মাশুল ত্রিপুরা ২০ পয়সা উত্তর পূর্ব ভারত ৩০ পয়সা

১২

বন্দি হয়ে থাকতে কেই-বা ভালবাসে? সকলেই চায় মুক্তি আর স্বাধীনতা। বন্দিদশা থেকে নিজেকে মুক্ত করতে সেই প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ অনেক বিপজ্জনক অভিযানে অংশ নিয়েছে। প্রাচীনকালে পলাতকদের সম্বল ছিল উপস্থিত বুদ্ধি, দুর্জয় সাহস আর অদম্য মনোবল। বর্তমান যুগের পলাতকদের এই গুণগুলি তো আছেই, তার ওপর বাড়তি সুবিধে হল নানারকম অত্যাধুনিক উপকরণ। বিশ্বের প্রতিটি মুক্তিযুদ্ধ, প্রতিটি আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে পলাতকদের নাম। সেইসব অন্তর্ধানের ইতিহাস যেমন চমকপ্রদ, তেমনই রোমহর্ষক। পলাতকদের অভিযানের বিচিত্র সব উপায় ও দুঃসাহসিক কাণ্ডকারখানা নিয়েই এবারের প্রচ্ছদকাহিনী।

৪০

ডেসমন্ড হেন্স শুধু ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের নির্ভরযোগ্য ক্রিকেটার নন, বিশ্বের অন্যতম সেরা ওপেনার। হেন্স-গ্রিনিজকে বলা যায় বিশ্বসেরা ওপেনিং জুটি। হেন্স এখন ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট দলের অধিনায়ক নির্বাচিত হয়েছেন। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ১৯৭৮ সালে প্রথম টেস্ট খেলেন হেন্স। অধিনায়ক হিসেবে হেন্স এবং তাঁর দলের সাফল্যের সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে একটি নিবন্ধে।

৩২

পৃথিবীতে প্রায় ন' হাজার প্রজাতির পাখি দেখতে পাওয়া যায়। এমু, পেঙ্গুইন বা অ্যালবাট্রসের মতো পাখির আকার যেমন বড়, তেমনই আছে ক্ষুদ্র আকৃতির পাখি। সবচেয়ে ছোট পাখির নাম হামিংবার্ড। এই পাখি সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে একটি নিবন্ধে।

■ আগামী সংখ্যায় ■

প্রচ্ছদকাহিনী

কেমন চলছে ইউরোপের ফুটবল

শৈলেন ঘোষের সম্পূর্ণ নাটক

টুপুর ও এক শয়তান

অনীশ দেবের কল্পবিজ্ঞানের গল্প

সন্দেহের এক কণা

খেলাধুলো, কুইজ ও কমিক্স

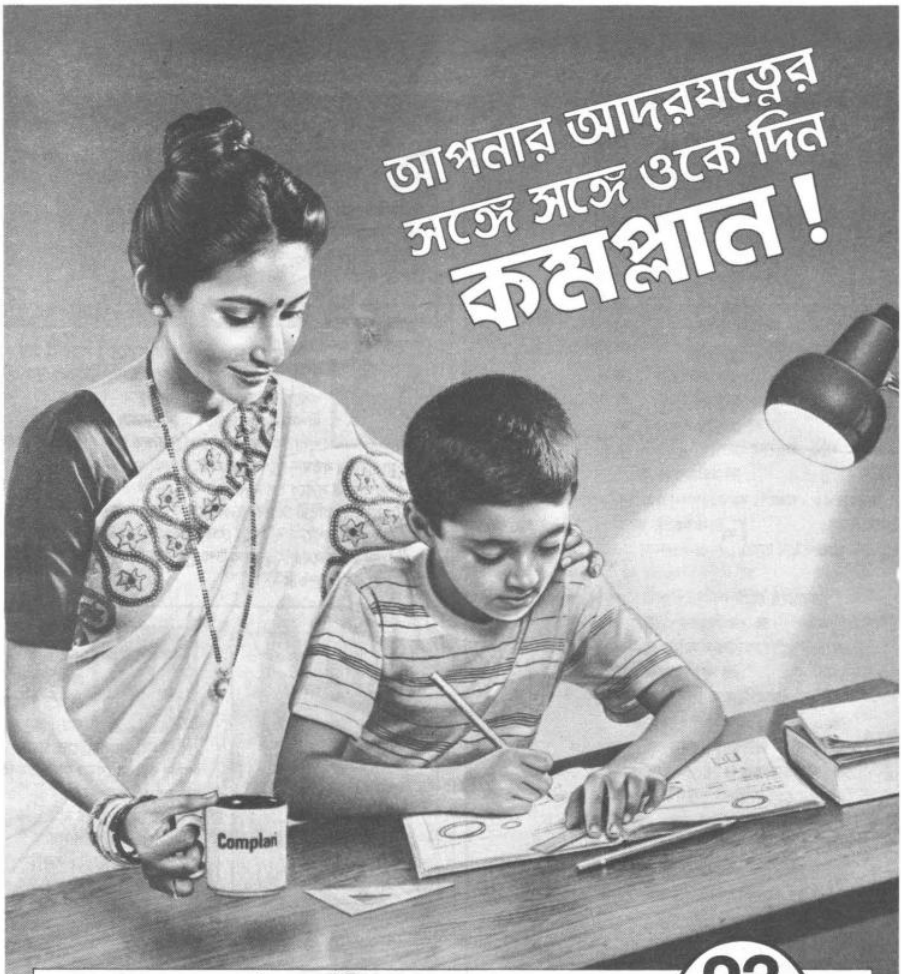

আপনার আদরযত্নের
সঙ্গে সঙ্গে ওকে দিন
কমপ্লান!
Complan
বাচ্চার সুস্থসবল থাকা খুবই দরকার, বিশেষ করে লেখাপড়া শেখার সময়। কমপ্লানে ২০% প্রোটিন আছে - যা ওদের সেরা দুধের প্রোটিন যোগায়।
এছাড়া আছে, ২২ রকমের একান্ত প্রয়োজনীয় খাদ্যগুণ - যেমন, কার্বোহাইড্রেট, ফ্যাট, রকমারি ভিটামিন আর খনিজ পদার্থ - বাড়তি পুষ্টির জন্যে এসবই ওদের দরকার। আপনার বাচ্চাদেরও কমপ্লান খাওয়াতে শুরু করুন - দিনে দুবার প্রতিদিন।
Complan
23
সুপরিকল্পিত মাত্রায়,
২৩টি একান্ত
প্রয়োজনীয় খাদ্যগুণ
দুধ মেশানোর প্রয়োজন নেই।
কমপ্লান®
সুপরিকল্পিত সম্পূর্ণ আহার।

GX/59/234 BEN

চিঠিচাপাটি

ক্যাপ্টেন স্কট

৫ সেপ্টেম্বর সংখ্যার কুইজ বিভাগে, কুমেরু অভিযান প্রসঙ্গে ক্যাপ্টেন স্কটকে নিয়ে লেখা নিবন্ধটিতে কয়েকটি অসঙ্গতি রয়েছে—"এরকমই এক অভিযানের সময় ডঃ উইলসন ও ই এইচ শ্যাকলটনের সঙ্গে স্কট পৌঁছলেন ৮২° ১৬' ৩৩" দক্ষিণ অক্ষাংশে।" —শ্যাকলটন আসলে স্কটের মৃত্যুর পর অভিযান চালান এবং কুমেরুর সীমানার ১১১ মাইল ভেতরে প্রবেশ করতে সক্ষম হন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, তিনি দক্ষিণ চৌম্বক মেরু আবিষ্কার করেন এবং স্কটের মতোই তিনিও প্রাকৃতিক প্রতিকূলতার শিকার হয়ে প্রাণ হারান।

প্রসঙ্গত জানাই, স্কট কুমেরু সীমানার ৫৪০ মাইল ভেতরে প্রবেশ করেছিলেন।

২· "সেদিন ১৮ জানুয়ারি। পৌঁছে দেখলেন সেখানে উড়ছে নরওয়ের জাতীয় পতাকা।"

—সেদিনটা ১৮ নয়, ছিল ১৭ জানুয়ারি। আর ১৬ ডিসেম্বর ঠিক একমাস আগে আমুণ্ডসেন দক্ষিণ মেরুতে নরওয়ের জাতীয় পতাকা পুঁতে দেন।

প্রসঙ্গত জানাই, স্কটের ডায়েরিটা ব্রিটিশ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত এবং সেখান থেকেই প্রাকৃতিক প্রতিকূলতার ঘটনাগুলো জানা গেছে।

আশিস দাস
দুর্গাপুর-১২

সম্পাদকীয় উত্তর : আশিসবাবুর চিঠির উত্তরে জানাই, "শ্যাকলটন আসলে স্কটের মৃত্যুর পর অভিযান চালান" কথাটি ঠিক নয়।

শ্যাকলটন স্কটের সঙ্গেই প্রথম দক্ষিণমেরুতে গিয়েছিলেন। পরে তিনি স্কার্ভি রোগে আক্রান্ত হলে স্কট তাঁকে দেশে ফেরত পাঠিয়ে দেন।

দ্বিতীয়ত, "দিনটা ছিল ১৮ নয়, ১৭ জানুয়ারি", এই তথ্য ঠিক নয়। ম্যাকগ্রিউ-হিল কর্তৃক প্রকাশিত 'এনসাইক্লোপিডিয়া অব ওয়ার্ল্ড বায়োগ্রাফি' গ্রন্থের নবম খণ্ডে, ৪৮৫ পৃষ্ঠায় লেখা আছে, 'স্কট রিচড দ্য পোল অন জানুয়ারি এইটিনথ --।' 'এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা'র দশম খণ্ডে, ৫৬৫ পৃষ্ঠায় স্কটের জীবনীতেও উল্লিখিত তারিখটিও কিন্তু ওই ১৮ জানুয়ারি।

তৃতীয়ত, আমুন্ডসেন স্কটের আগে পৌঁছেছিলেন। তাই স্কট সেখানে নরওয়ের জাতীয় পতাকা উড়তে দেখেছিলেন। কিন্তু আশিসবাবু আপনি আমুন্ডসেনের দক্ষিণ মেরুতে পৌঁছনোর তারিখটি ভুল লিখেছেন। ১৬ ডিসেম্বর নয়, ১৪ ডিসেম্বর আমুন্ডসেন দক্ষিণ মেরুতে পৌঁছেছিলেন।

এক নতুন মহাদেশের গল্প

আমি একজন আপনাদের পত্রিকার নিয়মিত পাঠিকা। গত ৫ সেপ্টেম্বর ১৯৯০ আনন্দমেলার প্রচ্ছদকাহিনী 'কুমেরুর অভ্যন্তরে' পড়ে খুব ভাল লাগল। লেখাটি সত্যিই সুন্দর ও তথ্যবহুল। বর্তমানে সারা পৃথিবীর অভিযাত্রী, জীববিদ, রসায়নবিদ সবারই কাছে অ্যান্টার্কটিকা ভীষণ আকর্ষক। আর ডঃ সুদীপ্তা সেনগুপ্তের তোলা ফোটোগুলিও ভীষণ সুন্দর, তাঁর সঙ্গে গৌতম চক্রবর্তীর নেওয়া সাক্ষাৎকারটিও পড়ে অনেক কিছু জানা গেল। আপনাদের পত্রিকার প্রচ্ছদকাহিনীগুলির নির্বাচন সত্যিই প্রশংসার দাবি রাখে। প্রতিটি প্রচ্ছদকাহিনীই ভীষণ আকর্ষক।

পাপিয়া সেন, রামরাজাতলা, হাওড়া

৫ সেপ্টেম্বর সংখ্যায় কুমেরুর অভ্যন্তরে প্রচ্ছদকাহিনীটি পড়ে খুব ভাল লাগল। এক নতুন মহাদেশের গল্প পড়লাম। অনেক মূল্যবান তথ্য জানতে পেরে ভীষণ খুশি হয়েছি। এ ছাড়া ভাল লেগেছে

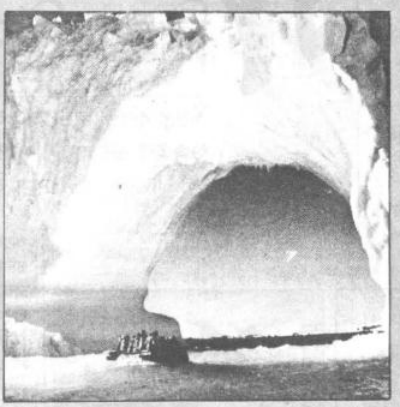

চিত্রা দেবের 'মালাম্মার প্রতিজ্ঞা', স্মৃতিকণা মুখোপাধ্যায়ের 'ফুলকুঁড়ি' এবং খেলা বিভাগের প্রতিটি লেখাই।

দেবীপ্রসাদ সরকার, নিমপুরা, খড়্গপুর

৫ সেপ্টেম্বরের প্রচ্ছদকাহিনী স্বপনকুমার দাসের কুমেরুর অভ্যন্তরে পড়ে খুব ভাল লাগল। অনেকদিন থেকেই আনন্দমেলার পাতায় এরকম একটি তথ্যসমৃদ্ধ লেখা আশা করছিলাম। তথ্যবহুল এই রচনায় অ্যান্টার্কটিকা সম্বন্ধে অনেক অজানা তথ্য জানতে পারলাম। সেজন্য লেখককে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। ভারতীয় বিজ্ঞানী ডঃ সুদীপ্তা সেনগুপ্তের মূল্যবান সাক্ষাৎকার গ্রহণ করার জন্য গৌতম চক্রবর্তীকে অজস্র ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

মধুশ্রী, শালিনী, ঝিমলি সেনগুপ্ত, পর্ণশ্রী, কলকাতা-৬০

কেরিয়ার গাইড

কেরিয়ার গাইড বিভাগটি আমার খুব ভাল লাগে। এই বিভাগটি থেকে আমি অনেক প্রয়োজনীয় পরামর্শ পাই। গোয়েন্দা হতে গেলে কী কী পড়তে হবে এবং কোথায় যোগাযোগ করতে হবে যদি জানান, খুব ভাল হয়।

সুদীপ্ত বাগচী, প্রদীপ ঘোষ
ঝাপানডাঙা, বর্ধমান

সম্পাদকীয় উত্তর : গোয়েন্দা হতে হলে অপরাধ বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করা দরকার। এ ছাড়া ক্রিমিনোলজি, ফরেনসিক সায়েন্সও পড়তে হয়। ডিটেকটিভ ট্রেনিং নিতে পারলেও সুবিধে হয়।

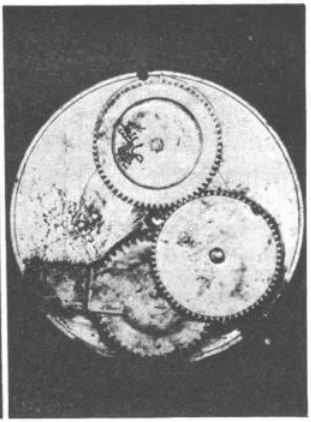

১২২১ খ্রিস্টাব্দে আবুবকর তৈরি করেছিলেন গিয়ার চালিত এই যন্ত্র

গতি-প্রযুক্তির নেপথ্যে

গিয়ার ব্যবস্থা ছাড়া যান্ত্রিক গতি সম্ভব নয়। কবে থেকে শুরু হল এই গিয়ার ব্যবস্থার প্রচলন, এর বিবর্তনই বা হল কীভাবে, এই নিয়ে লিখেছেন কৌশিক মুখোপাধ্যায়

আধুনিক সভ্যতার উল্লেখযোগ্য দুটি আবিষ্কার, আগুন ও চাকা। সমস্ত ধরনের যান্ত্রিক গতি এবং আধুনিকতম স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতির গঠনের ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে চাকার আবিষ্কার। বিজ্ঞানীমহলে এ-কথা স্বীকৃত যে, প্রকৃতি-পর্যবেক্ষণ থেকেই মানুষের বিজ্ঞানভাবনার সূত্রপাত। চাকার আবিষ্কারের ক্ষেত্রেও প্রকৃতির এই অবদান অনস্বীকার্য। পাহাড়ের ঢাল দিয়ে গড়িয়ে পড়া মোটা গাছের গুঁড়ি অথবা নদীর স্রোতে গোলাকার নুড়ির এগিয়ে যাওয়ার মধ্যেই আদিম মানুষ গোলাকার বস্তুর সঙ্গে সরলপথে যান্ত্রিক গতির সম্বন্ধ খুঁজে পেয়েছিল। পরবর্তীকালে ভারী কোনও বস্তু এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় নিয়ে যাওয়ার জন্য পরপর গাছের গুঁড়ি সাজিয়ে তার ওপর দিয়ে বস্তুটিকে গড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থাই চাকার প্রথম ব্যবহার বলে বিজ্ঞানীরা মনে করেন। কালের গতির সঙ্গে-সঙ্গে বিবর্তন ঘটেছে চাকার। অনুসন্ধিৎসু মানুষ চাকার সাহায্যে সরল গতিতেই সন্তুষ্ট থাকেনি, চাকার ঘূর্ণন গতি ব্যবহার করে বিভিন্ন ধরনের স্বয়ংক্রিয় অথবা আধা-স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতি তৈরির চেষ্টায় মেতেছে। তখনই প্রয়োজন হয়েছে গতি স্থানান্তর পদ্ধতির। গতির দিক পরিবর্তন অথবা নির্দিষ্ট অনুপাতে গতি স্থানান্তর করার জন্য বিশেষ ধরনের দাঁতযুক্ত চাকার ব্যবহার শুরু হয়। নির্দিষ্টসংখ্যক দাঁতযুক্ত এই ধরনের একাধিক চাকার সমন্বয়ে যে গিয়ার ব্যবস্থা তৈরি করা যায় তার সাহায্যে বিভিন্ন ধরনের জটিল অথচ সুনির্দিষ্ট গতি উৎপন্ন করা সম্ভব। এই গিয়ার ব্যবস্থা ছাড়া কোনও যানবাহন, স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রাদি অথবা কলকারখানার কথা ভাবাই যায় না। গিয়ার ব্যবস্থার সাহায্যে গতি উৎপাদনের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় রোমান সভ্যতার ইতিহাসে। যদিও প্রাচীন রোমান গিয়ার ব্যবস্থার কোনও পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন বা প্রমাণ পাওয়া যায় না। খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে লিখিত ভিট্রুভিয়াসের 'অন আর্কিটেকচার' বইয়ে একধরনের ভারী গিয়ার ব্যবস্থার কথা পাওয়া যায়, যা উল্লম্ব বস্তুর সাহায্যে জল-তোলা এবং সেই জলকে অনুভূমিক নালিপথে নিয়ে যাওয়ার কাজে ব্যবহার করা হত।

অ্যান্টি-কাইথেরা ধ্বংসস্তূপে প্রাপ্ত যান্ত্রিক ক্যালেন্ডার ও তার এক্স-রে চিত্র

1

2

জ্যোতির্বিজ্ঞান সংক্রান্ত এই যন্ত্রটি তৈরি হয়েছিল ফ্রান্সে ১৩০০ খ্রিস্টাব্দে। এর সাহায্যে সূর্য এবং চন্দ্রের গতিপথ নির্ণীত হত। মধ্যযুগে তৈরি এই যন্ত্রটির পরিকল্পনায় প্রাচীন হেলেনিস্টিক ধারার ছাপ সুস্পষ্ট। বর্তমানে এটি লন্ডনের সায়েন্স মিউজিয়ামে রয়েছে।

১০০০ খ্রিস্টাব্দে অল-বিরুনির বানানো 'বক্স অব দ্য মুন' যন্ত্রের নকশা

এই ধরনের ভারী গিয়ার ব্যবস্থা ছাড়াও সূক্ষ্ম গাণিতিক গিয়ার ব্যবস্থার সাহায্যে তৈরি বেশ কিছু স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যায় প্রাচীন সাহিত্যে। খ্রিস্টজন্মের ৬২ বছর পরে আলেকজান্দ্রিয়ার হিরোর লেখা 'মেকানিকা' বইয়ে গিয়ার চালিত হোডোমিটার যন্ত্রের বর্ণনা আছে। যন্ত্রাদির বর্ণনা ছাড়াও গিয়ার ব্যবস্থার জটিল বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব। গিয়ার অনুপাতের গাণিতিক বিশ্লেষণও পাওয়া যায় এই বইয়ে। তাঁরই লেখা 'নিউম্যাটিকা' নামে অন্য একটি বইয়ে হিরো আবিষ্কৃত গিয়ার চালিত স্বয়ংক্রিয় আরও কিছু যন্ত্রপাতির কথা রয়েছে, যেগুলি 'অটোমেটা' নামে পরিচিত। এই অটোমেটা যন্ত্রগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য স্বয়ংক্রিয় দরজা এবং পশুপাখির সচল প্রতিকৃতি। এই ধরনের যন্ত্রগুলি যে বাস্তবেও রূপায়িত হয়েছিল তারও প্রমাণ পাওয়া গেছে। সম্রাট নিরোর জন্য নির্মিত প্রাসাদের বর্ণনা দিতে গিয়ে ৬৯ খ্রিস্টাব্দে স্যুটোনিয়াস এই ধরনের কিছু অটোমেটার কথা লিখেছেন। শুনতে অবাক লাগলেও তাঁর লেখায় নিরোর প্রাসাদকক্ষে অবস্থিত গায়ক পাখি এবং গর্জনরত সিংহের স্বয়ংক্রিয় মূর্তির কথা পাওয়া যায়। এ-কথা ঠিক যে, প্রাচীন সাহিত্য ছাড়া হিরো বর্ণিত এই ধরনের অটোমেটাগুলির অস্তিত্বের কোনও পুরাতাত্ত্বিক প্রমাণ নেই ; কিন্তু তার মানে এই নয় যে,এগুলি নিছক কাল্পনিক অথবা নিছক তাত্ত্বিক যন্ত্র। তার কারণ প্রায় সেই সময়ে ব্যবহৃত একই ধরনের অন্য একটি গিয়ার চালিত স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের ক্ষয়ে যাওয়া ভগ্নাংশ পাওয়া গেছে অ্যান্টিকাইথেরা ধ্বংসস্তূপ থেকে, ১৯০০ সালে। দুর্মূল্য সেই ভগ্নাংশটি বর্তমানে আথেন্সের ন্যাশনাল আর্কিওলজিক্যাল মিউজিয়ামে রাখা আছে। খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দী অ্যান্টিকাইথেরা ধ্বংসস্তূপের সময়কাল বলে চিহ্নিত হয়েছে এবং পূর্ব-উল্লিখিত যন্ত্রাংশটিও যে একই সময়ের, তা 'হেলেনিস্টিক' যুগ বলে চিহ্নিত—তাও প্রমাণিত হয়েছে। ক্ষয়ে যাওয়া সেই যন্ত্রের গায়ে কিছু দাঁতযুক্ত চাকা দেখতে পাওয়া যায়। এক্স-রের সাহায্যে সেই ভগ্নাংশটির পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে যে, ওই যন্ত্রের গায়ে ৩১টি দাঁতযুক্ত চাকা আছে এবং পুরো যন্ত্রটিতে আরও বেশ কিছু ওই ধরনের চাকা ছিল বলে অনুমান করা

আঁকার কাজে স্পাইরোগ্রাফ

স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতি, যানবাহন অথবা কলকারখানা ছাড়াও গিয়ার ব্যবস্থা ব্যবহৃত হয় আঁকাজোকার কাজেও। যন্ত্রটির নাম স্পাইরোগ্রাফ (ব্রেনোগ্রাফ নামটিও প্রচলিত)। অবশ্য যন্ত্র বললে অত্যুক্তি হয়। ভেতরের বৃত্তে দাঁতযুক্ত একটি বলয়াকৃতি বড় চাকা, আর তিন-চারটি ছোট দাঁতযুক্ত চাকা—এই নিয়ে তৈরি হয় স্পাইরোগ্রাফ। বাজারে যে স্পাইরোগ্রাফ কিনতে পাওয়া যায় তার বড় চাকাটিতে থাকে ১০৫টি দাঁত। ছোট চাকাগুলিতে দাঁত থাকে যথাক্রমে ৮০, ৭২, ৫২, ৫০ এবং ৪৫টি। এই বড় চাকা, ছোট চাকা আর একটা ডটপেনের সাহায্যে এঁকে ফেলা যায় অসংখ্য জ্যামিতিক নকশা, যেগুলি হঠাৎ দেখলে চমকে যেতে হয়। এইসব

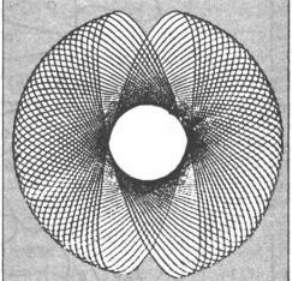

জ্যামিতিক নকশায় আরও বৈচিত্র্য আনে নানা রঙের ডটপেনের ব্যবহার। স্পাইরোগ্রাফের গঠন খুব সরল হলেও এর পেছনের গাণিতিক তত্ত্ব কিন্তু বেশ জটিল। গিয়ার ব্যবস্থার সাহায্যে ডটপেনটিকে চালিত করা হচ্ছে একটি নির্দিষ্ট গতিপথে, যা কখনও বৃত্ত, কখনও 'হলিপ', কখনও 'প্যারাবোলা', 'হাইপারবোলা' কখনও-বা আরও জটিল কোনও জ্যামিতিক বক্ররেখা। নানা ধরনের এরকম বক্ররেখার সাহায্যেই গড়ে ওঠে এক-একটি নির্দিষ্ট জ্যামিতিক নকশা। ছোট চাকার দাঁতের সংখ্যা বাড়া-কমার সঙ্গে, অর্থাৎ গিয়ার অনুপাতের পরিবর্তনের সঙ্গে-সঙ্গে ডটপেনের গতিপথও যায় পালটে। তার ফলে তৈরি হয় নতুন কোনও নকশা। বিজ্ঞান আর শিল্প যে বিচ্ছিন্ন দুটি বিষয় নয়, স্পাইরোগ্রাফ তার একটি ভাল উদাহরণ।

গোলকধাঁধায় বন্ধু রয়েছে কোথায়?...

এর ফাঁকা জায়গাগুলিতে সঠিক মিলিয়ে মিলিয়ে রঙ করো আর
দেখো বন্ধু রয়েছে কোথায়। এমন বন্ধু যে দেখতে ছোট্টখাট্ট,
অতি আদরের আর মমতায় ভরা খুবই নির্ভরযোগ্য।

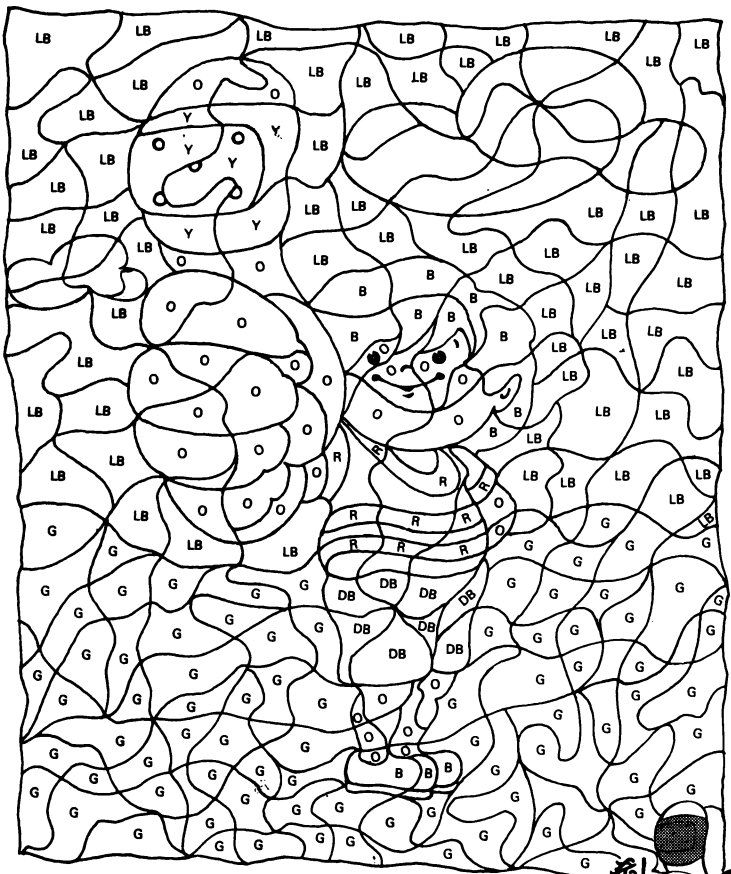

এমন বন্ধু আর কে? হ্যাণ্ডিবয়!

R —লাল
O —কমলা
B —কালো
DB—গাঢ় নীল
LB—হাল্‌কা নীল
G —সবুজ
Y —হলুদ

HTA 2887

ভাঁজ দেয়া লাইন বরাবর কেটে নাও

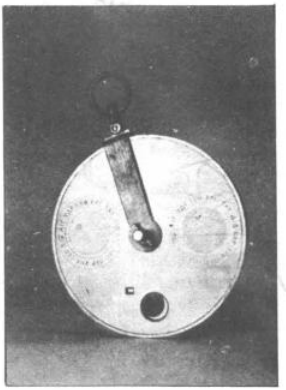

গিয়ারযুক্ত এই যন্ত্রটি বাইজেন্টাইন যুগের প্রথম দিকের যন্ত্রকৌশলের নিদর্শন। এটি মূলত একটি সানডায়াল, যা গিয়ারব্যবস্থার সাহায্যে চাঁদের আকৃতি এবং দিনের হিসেবে চাঁদের বয়স প্রদর্শন করত। এর সাহায্যে জোডিয়াক তলে সূর্য এবং চাঁদের অবস্থান নির্ণয় করা যেত।

যায়। ভগ্নাংশটি আবিষ্কারের পর গবেষণা করে অধ্যাপক ডেরেক ডিসুলা প্রাইস প্রমাণ করেন যে, প্রাচীন সেই যন্ত্রটি একটি গিয়ার চালিত যান্ত্রিক ক্যালেণ্ডার, যার সাহায্যে একটি বিশেষ তলে (জোডিয়াক) সূর্য এবং চন্দ্রের গতিপথ নির্ণীত হত। এ ছাড়াও যন্ত্রটির সাহায্যে গ্রহ-নক্ষত্র সংক্রান্ত আরও কিছু গণনাকার্য সম্পন্ন করা যেত বলে তিনি মনে করেন।

পরে ১৯৮৩ সালে প্রায় একই ধরনের গিয়ারযুক্ত আর-একটি যন্ত্রের চারটি ভগ্নাংশ আবিষ্কৃত হয়, যেগুলি বর্তমানে লণ্ডনের সায়েন্স মিউজিয়ামে রয়েছে। হেলেনিস্টিক ধারার সুস্পষ্ট সাক্ষ্য বহন করলেও এই ভগ্নাংশগুলি বাইজেন্টাইন যুগের (৩২৮ – ৬৪১ খ্রিঃ) একেবারে প্রথমদিকের নিদর্শন বলে প্রমাণিত হয়েছে। ভগ্নাংশগুলি পুনরুদ্ধারের পর দেখা গেছে যে, এটি মূলত একটি সানডায়ালের অংশ, যা গিয়ার ব্যবস্থার সাহায্যে চাঁদের আকৃতি এবং দিনের হিসেবে চাঁদের বয়স প্রদর্শন করত। এ ছাড়াও এর সাহায্যে জোডিয়াক তলে সূর্য এবং চাঁদের অবস্থান নির্ণয় করা যেত।

বাইজেন্টাইন যুগের এই যন্ত্রটির গঠনরীতির প্রত্যক্ষ প্রতিফলন খুঁজে পাওয়া যায় পার্শি গবেষক অল-বিরুনি (৯৭৩ – ১০৪৮ খ্রিঃ) বর্ণিত বক্স অব দ্য মুন যন্ত্রে। অল-বিরুনি বর্ণিত বক্স অব দ্য মুন-এর সময়কাল ১০০০ খ্রিস্টাব্দে, অর্থাৎ বাইজেন্টাইন যুগের প্রায় ছ'শো বছর পরে। সুতরাং সূক্ষ্ম গাণিতিক গিয়ার ব্যবস্থার প্রাচীন হেলেনিস্টিক ধারা অব্যাহত থেকেছে দীর্ঘকাল ধরে। ১২২১ খ্রিস্টাব্দে আবু বকর নামে অন্য এক পার্শি জ্যোতির্বিদের নির্মিত সমধর্মী একটি যন্ত্রেও এই ধারা ছাপ ফেলেছে। আবুবকর দ্বারা স্বাক্ষরিত এই যন্ত্রটিও চাঁদের আকৃতি বয়স, সূর্য-চন্দ্রের অবস্থান ইত্যাদি প্রদর্শন করত। যন্ত্রটি বর্তমানে অক্সফোর্ড-এর মিউজিয়াম অব দ্য হিস্ট্রি অব সায়েন্স-এ রয়েছে।

আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, ১৩০০ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত একটি ফরাসি জ্যোতির্বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রেও (যা লণ্ডনের সায়েন্স মিউজিয়ামে রয়েছে) সেই প্রাচীন হেলেনিস্টিক ধারার ছাপ খুঁজে পাওয়া যায়।

এ-নিয়ে গবেষণা এখনও চলছে। চলছে বিভিন্ন পুরাতাত্ত্বিক অভিযান, অনুসন্ধান, খননকার্য। হয়তো আগামীদিনের কোনও আবিষ্কার নতুন দিগন্ত খুলে দেবে ; গিয়ার ব্যবস্থা প্রচলনের ইতিহাসে নতুন কোনও সংযোজন হবে, যা সভ্যতার ইতিহাসকে পিছিয়ে দেবে আরও কয়েকশো অথবা কয়েক হাজার বছর। ইতিহাস যেমন পিছিয়ে যায় তেমন করেই বিজ্ঞান এগিয়ে চলে।

নিত্য-নতুন আবিষ্কারের সঙ্গে-সঙ্গে গিয়ার ব্যবস্থারও ঘটেছে অনেক পরিবর্তন। নিজের কক্ষপথে পৌঁছে স্যাটেলাইটের আলোক সক্রিয় সোলার প্যানেল স্বয়ংক্রিয়ভাবে খুলে যাচ্ছে বা দিক পরিবর্তন করছে, এ-কথা শুনলে আজ আর আমরা বিস্মিত হই না। কম্পিউটারের সাহায্যে আজ জটিলতম গতি উৎপাদনের জন্যও প্রয়োজনীয় গিয়ার ব্যবস্থা তৈরি করা যাচ্ছে সহজেই। প্রথম শতাব্দীতে হিরো আবিষ্কৃত সেই অটোমেটাগুলি আজ বিবর্তনের পথ ধরে পৌঁছেছে রোবোটিক্সের যুগে, যা একুশ শতকে সভ্যতার সংজ্ঞাই বদলে দেবে।

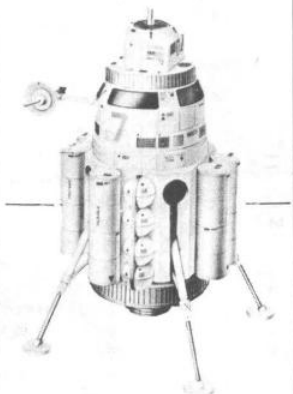

আগামী একবিংশ শতাব্দীতে চাঁদের মাটিতে নামবে 'লুনার ল্যান্ডার' নামে বিশেষ এই মহাকাশযান। আধুনিক প্রযুক্তিতে তৈরি এই যানে তীব্র সুবেদী একটি অ্যান্টেনা, ল্যান্ডিং গিয়ার সবই উপস্থিত। কম্পিউটারের সাহায্যে এর গিয়ার ব্যবস্থায় উৎপন্ন করা যায় প্রয়োজনীয় সবরকম জটিল গতিবৈচিত্র্য।

বিজ্ঞান : যেখানে যা হচ্ছে

অচেতন অবস্থায় শোনা

বহু বছর ধরেই ডাক্তারদের সন্দেহ ছিল যে, কোনও রোগী সংজ্ঞাহীন অবস্থাতেও তার চারপাশের কথাবার্তা শুনতে পায় । সম্প্রতি আমেরিকা ও ইংল্যান্ডের গবেষণায় এই ধারণাই বদ্ধমূল হয়েছে, ওষুধের প্রভাবে সংজ্ঞাহীন রোগীরা অপারেশন থিয়েটারের কথাবার্তা শুধু যে শুনতে পায় তা নয়, তার অর্থও বুঝতে পারে ।

আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যানেসথিসিওলজিস্ট এম ঘোনাইম এ-বিষয়ে একটি পরীক্ষা চালান । ওষুধের প্রভাবে সংজ্ঞাহীন একদল রোগীকে তিনি কতকগুলো শব্দের একটি তালিকা পড়ে শোনান । অপারেশনের পরদিন তাঁদের প্রত্যেককে একটি তালিকা দেখানো হয় । এই তালিকায় বেশ কয়েকটি অসম্পূর্ণ শব্দ ছিল । অর্ধেকেরও বেশি রোগী সঠিক অক্ষর বসিয়ে শব্দগুলো সম্পূর্ণ করে দিতে সক্ষম হন । তাঁরা সংজ্ঞাহীন অবস্থায় শব্দগুলো শুনেছিলেন, কিন্তু সে কথা তাঁদের মনে ছিল না । এই একই রোগীদের আচ্ছন্ন অবস্থায় নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল তাঁদের কান-নাক স্পর্শ করার জন্য । ওষুধের প্রভাব কেটে যাওয়ার পরেও তাঁরা সার্জনের নির্দেশিত প্রত্যঙ্গ— কান অথবা নাক— স্পর্শ করেছিলেন । তাঁদের জিজ্ঞেস করে জানা যায়, সার্জেনের নির্দিষ্ট কোনও নির্দেশের কথা তাঁদের মনে নেই । এ-থেকে ঘোনাইমের মত হল, সংজ্ঞাহীন অবস্থাতেও কিছু-কিছু অংশের কাজ চলতে থাকে ।

গ্রেট ব্রিটেনের সেন্ট টমাস হসপিটালের অ্যানেসথিসিওলজিস্ট ক্যালটন ইভান্স ও পি এইচ রিচার্ডসন প্রমাণ করেছেন যে, সংজ্ঞাহীন রোগীর মধ্যে কোনও ধারণা-সঞ্চার করলে সেই রোগী অপারেশনের পর দ্রুত সেরে ওঠে । তা ছাড়া এই রোগীদের অপারেশন-পরবর্তী জটিলতাও হয় কম ।

কিন্তু কীভাবে এইসব তথ্য ঢুকে যায় অচেতন রোগীর মগজে ? কী কারণেই বা দ্রুত সেরে ওঠে রোগী ? পরীক্ষামূলক প্রমাণ পেলেও এইসব প্রশ্নের তাত্ত্বিক উত্তর এখনও গবেষকদের কাছে অজানা ।

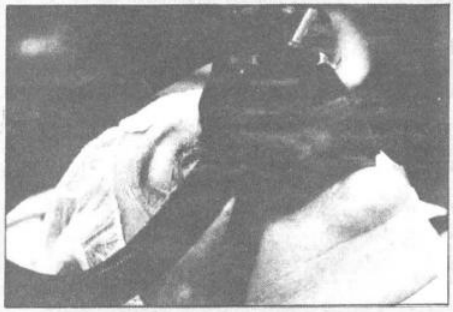

খুনি মৌমাছি রুখতে

খবর পাওয়া গেছে, আফ্রিকার খুনি মৌমাছির ঝাঁক এসে পৌঁছেছে টেক্সাসের ব্রাউন্স-ভিলে । আর এ-বছরের শেষাশেষি ওরা পৌঁছে যাবে রিও গ্র্যান্ড ভ্যালিতে । কিন্তু গৃহপালিত মৌমাছির চাকে যদি ওরা দখল বসাতে চেষ্টা করে তা হলে ওদের শক্ত বাধার মুখোমুখি হতে হবে ।

ইউরোপের গৃহপালিত মৌমাছি (যাদের কাছ থেকে মধু পাওয়া যায়) ও খুনি মৌমাছির মধ্যে কয়েকটি ফারাক রয়েছে । যেমন, খুনি মৌমাছির দেহ এবং ডানা গৃহপালিত মৌমাছির তুলনায় ছোট । কিন্তু ওদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তফাত হল ডানা নাড়ার তালে । খুনি মৌমাছির ডানা নাড়ার হার গৃহপালিত মৌমাছির তুলনায় বেশি । এই তথ্যটুকুর ওপরে নির্ভর করেই টেনেসির ওক রিজ ন্যাশনাল ল্যাবরেটরির প্রযুক্তিবিদেরা তৈরি করেছেন একটি '২-চ্যানেল' নয়েজ অ্যানালাইজার । এই যন্ত্রটি মৌমাছির ডানা নাড়ার কম্পাঙ্ক মাপতে পারে । আফ্রিকার খুনি মৌমাছির ক্ষেত্রে কম্পাঙ্কের মান প্রতি সেকেন্ডে ২৫০ থেকে ২৭৫ । আর ইউরোপের গৃহপালিত মৌমাছির ক্ষেত্রে এই মান প্রতি সেকেন্ডে ২১০ থেকে ২৩০ । এই তফাতের ভিত্তিতেই ওক রিজের প্রযুক্তিবিদের দল— অর্থাৎ মাইকেল ই বুকানন, হাওয়ার্ড টি কার এবং কেনেথ এইচ ভ্যালেনটাইন তৈরি করেছেন কম্পাঙ্কের 'ছাঁকনি' । এই যন্ত্রের মধ্যে রয়েছে একটি ফ্লাইট চেম্বার বা উড়ান কক্ষ । সেখানে একটি মৌমাছিকে ছেড়ে দিলেই হল ! যদি যন্ত্রের প্যানেলে একটি সবুজ বাতি জ্বলে ওঠে তা হলে মৌমাছিটি সম্ভবত নিরীহ । কিন্তু লাল বাতি জ্বলে উঠলেই ভয়ের কথা ।

মৌমাছিটি সম্ভবত আফ্রিকার খুনি মৌমাছি । কার বলেছেন, মৌ-পালন কেন্দ্রের মালিকরা যদি মৌচাকের ভেতরে কোনও খুনি মৌমাছির সন্ধান পান, তা হলে রানি

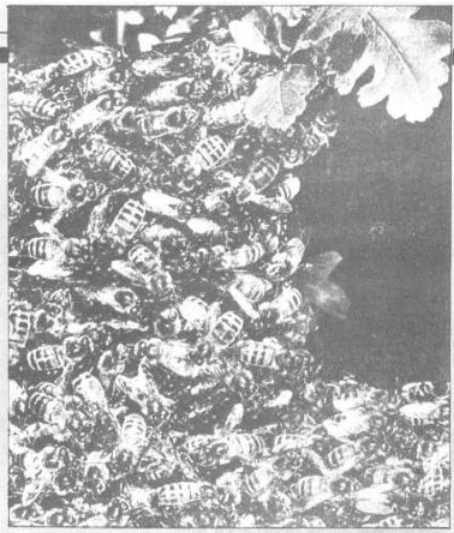

দু' ইঞ্চি থেকে দশ ইঞ্চি ব্যাসে

মহাকাশের ছায়া

এক সময়ে কাচের মার্বেল তৈরি করতেন জোশ সিম্পসন । বাচ্চাদের খেলার কাচের মার্বেল । তিনি তৈরি করতেন, আর ছোট-ছোট ছেলেমেয়েরা অবাক হয়ে দেখত । হঠাৎই একদিন পশ্চিম ম্যাসাচুসেট্স-এর এই কাচ-শিল্পীর মাথায় এল নতুন পরিকল্পনা । রঙিন কাচকে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে বেশ জটিল ধরনের বড় মাপের বল তৈরি করলে কেমন হয় ! ব্যস, শুরু হল সিম্পসনের নতুন শিল্পকলা, নাম 'প্ল্যানেটস' । দু' ইঞ্চি থেকে দশ ইঞ্চি ব্যাসের চিত্র-বিচিত্র কাচের গোলক, যেন মহাকাশে ভেসে বেড়ানো নানা গ্রহ-উপগ্রহ । এই কাজে সিম্পসন ব্যবহার করেন কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে তোলা বিভিন্ন ফোটোগ্রাফ আর কারিগরি নকশা । তারপর রঙিন ছবি আঁকেন তাঁর কল্পনার জগতের : সমুদ্র, পাহাড়, কুয়াশা, বনাঞ্চল, রুক্ষ প্রান্তর— কত কী ! মাত্র কয়েক ঘণ্টায় গোলকটি তৈরির কাজ শেষ হয়ে যায় । তারপরই শুরু হয় তার ভেতরের খুঁটিনাটি কাজ । দিনের

মৌমাছিটিকে বদলে দিয়ে চাকে ঢুকিয়ে দেবেন একটি ইউরোপের গৃহপালিত রানি মৌমাছি। তা হলেই খুনি মৌমাছির সংখ্যা আর বাড়তে পারবে না। বিজ্ঞানীরা তাঁদের নব-আবিষ্কৃত যন্ত্রটির নাম দিয়েছেন 'বাজ বাস্টার' এবং এর দাম ধার্য করেছেন তিনশো উনচল্লিশ ডলার। তাঁদের ধারণা, আমেরিকার তিন লক্ষ শখের মৌ-পালক ও চার হাজার মৌ-ব্যবসায়ীর কাছে যন্ত্রটি অল্পদিনেই জনপ্রিয় হয়ে উঠবে।

খুদে কম্পিউটারের কেরামতি

গাড়ি চালাতে-চালাতে হঠাৎই তেল ফুরিয়ে গেল। চালকের মাথায় হাত! কতদূরে পেট্রল-পাম্প কে জানে! তা ছাড়া যে-রাস্তা ধরে গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছেন, সেখানে কোথায়-কোথায় রয়েছে দেখার মতো জিনিস? এসব সমস্যার সমাধান করে দেবে ইন্টার-স্টেট ট্রাভেল কম্পিউটার। এই স্মৃতিকোঠায় বিভিন্ন হাইওয়ে সংক্রান্ত তিরিশ হাজার তথ্য জমানো আছে। ফলে রাস্তার দৈর্ঘ্য থেকে শুরু করে পথচলতি পেট্রল-পাম্প, হোটেল, দ্রষ্টব্য জিনিস, সব কিছুরই হদিস বিশদভাবে পাওয়া যাবে ইন্টার-স্টেট ট্রাভেল কম্পিউটারে। ম্যাডিসনের 'হুইসলার' কম্পানির তৈরি এই অভিনব কম্পিউটার এক কথায় গাড়ির চালকের 'প্রিয় বন্ধু'। এর দাম তেমন বেশি নয়, প্রায় একশো ডলার।

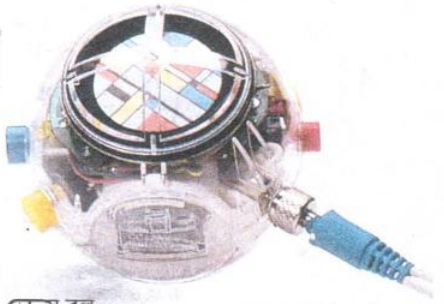

ড্রেস বল

দেখে মনে হবে, ঘর সাজানোর রঙিন খেলনা। লাল-নীল-হলদে রঙের মেলা, তাকে ঘিরে স্বচ্ছ প্লাস্টিকের আবরণ। নাম ড্রেস বল। অথচ নিছক খেলনা নয়। পাওয়ার জ্যাক খুঁজে সুইচ অন করলেই হল— শোনা যাবে এ এম বা এফ এম প্রোগ্রাম। অর্থাৎ, রেডিওর প্রোগ্রাম ছাড়াও শোনা যাবে টেলিভিশনের নানা অনুষ্ঠান। এ ছাড়াও ড্রেস বলে রয়েছে লাগোয়া স্পিকার আর হেডফোনের মাধ্যমে প্রোগ্রাম শোনার অ্যাডাপটার। ড্রেস বল তৈরি করেছে ক্যালিফোর্নিয়ার 'সুইচ ইট' কম্পানি। বিভিন্ন মাপের ড্রেস বলের দাম প্রায় তিরিশ থেকে চল্লিশ ডলার।

চাকার বায়ুচাপ মাপতে

নাম 'অ্যাকিউটায়ার'। কাজ গাড়ির চাকার হাওয়া ঠিক আছে কি না দেখে গাড়ির চালককে ঝটপট জানিয়ে দেওয়া। এই জানিয়ে দেওয়ার জন্যই রয়েছে ক্যালকুলেটরের মতো লিকুইড ক্রিস্টাল ডিসপ্লে প্যানেল। হাতসই যন্ত্রটির একটি বিশেষ অংশ চাকার ভালভের মুখে চেপে ধরলেই বায়ুচাপের মান ফুটে উঠবে প্যানেলে। যদিও এখন ইন্টারন্যাশনাল সিস্টেম অব ইউনিটস বা এস আই একক অনুযায়ী চাপের নির্ধারিত একক 'পাস্কাল' বা 'নিউটন/ বর্গমিটার', ব্যবহারিক সুবিধের জন্য অ্যাকিউটায়ারে বায়ুচাপ দেখানো হয় 'পাউন্ড/ বর্গইঞ্চি' এককে। যেমন,আমরা শরীরের প্রতি বর্গইঞ্চিতে যে-পরিমাণ বায়ুচাপ অনুভব করি, তার মান প্রায় ১৪·৭ পাউন্ড।

অ্যাকিউটায়ার তৈরি করেছে নিউ জার্সির এম এস আই কম্পানি। এর দাম মাত্র পঁচিশ ডলার।

চিত্র-বিচিত্র কাচের গোলক, যেন মহাকাশে ভেসে বেড়ানো নানা গ্রহ-উপগ্রহ....

পর দিন অক্লান্ত পরিশ্রমের পর ফুটে ওঠে ত্রিমাত্রিক ঢঙ। তারপর অভ্র, সোনা ও রুপো দিয়ে সূক্ষ্ম কারুকাজের পালা। তৈরি হয় রাতের শহরের আলোকমালা, জীবন্ত তৃণভূমি।

প্ল্যানেটের রঙিন কারুকাজ

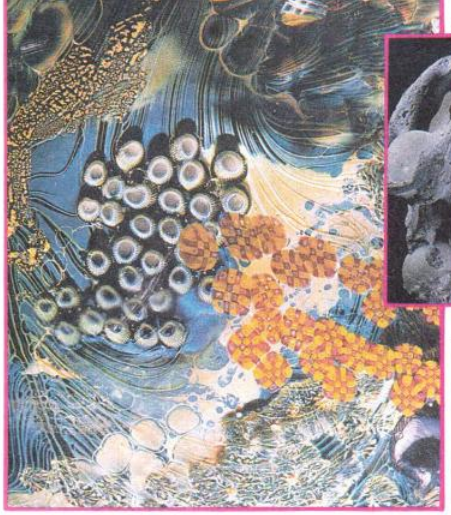

সিম্পসন তাঁর কারুকলায় ব্যবহার করেছেন টেকটাইট যৌগ। বিজ্ঞানীদের অভিমত, উল্কাপিণ্ড পৃথিবীতে এসে আঘাত করলে তৈরি হয় টেকটাইট। টেকটাইট এক ধরনের সিলিকেট গ্লাস। সিম্পসন টেকটাইটের রাসায়নিক বিশ্লেষণ করে তার বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের পরিচয়

টেকটাইট

জেনেছেন। জেনেছেন তাদের রাসায়নিক অনুপাত। তারপর নিজের চুল্লিতে সেইসব পদার্থ মিশিয়ে সিম্পসন তৈরি করেছেন ভিন্ন শ্রেণীর শিল্পকলা। যার নাম তিনি দিয়েছেন 'টেকটাইটস'। ছবিতে সিম্পসনের বিচিত্র শিল্পকলার নমুনা দেখানো হল।

ডুকাল
সঙ্গে

ক্যাপুয়া মল্লভূমির ধ্বংসাবশেষ। জানালাবিহীন এই অন্ধকূপ থেকেই পালিয়ে গিয়েছিলেন স্পার্টাকাস ও তাঁর সঙ্গিরা। শুরু হয়েছিল দাস-বিদ্রোহ

র ছাদ ভেঙে পালিয়ে যাচ্ছেন ক্যাসানোভা ।
মে এক সন্ন্যাসী

ডিঙি নৌকোয় করে জাহাজের দিকে চলেছেন যুদ্ধবন্দি গুপ্তার প্লাসকো । ইংল্যান্ডের সীমানা পেরিয়ে গেলেই মুক্তি

দুঃসাহসিক অভিযান

বিশ্বের প্রতিটি মুক্তিযুদ্ধ, প্রতিটি আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত পলাতকদের নাম । পলাতকদের অভিযানের বিচিত্র সব উপায় ও দুঃসাহসিক কাণ্ডকারখানা নিয়ে লিখেছেন সুপ্রতিম সরকার

আঠারো অগস্ট, উনিশশো একাত্তর । সবে সন্ধে হয়-হয় । মেক্সিকোর সান্তা মার্টা আকাতিতলা কারাগারের বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ প্রায় ফাঁকা হয়ে এসেছে । সারাদিনের খাটুনির পর প্রহরীদের সতর্ক দৃষ্টির মধ্যে কয়েদিরা যে যার নিজের সেলে ফিরছে । এরই মাঝে একধারে দাঁড়িয়ে কিসের জন্য যেন অপেক্ষা করছে দু'জন কয়েদি । জোয়েল কাপলান ও কার্লোস কাস্ত্রো । চোখেমুখে উত্তেজনা । বারবার এ ওর মুখের দিকে তাকাচ্ছে । পাশে দাঁড়ানো কাপলানকে ফিসফিস করে কী যেন বলল কাস্ত্রো । কিছুক্ষণের মধ্যেই আকাশ ফুঁড়ে উদয় হল এক নীল হেলিকপ্টার । প্রচণ্ড গর্জন

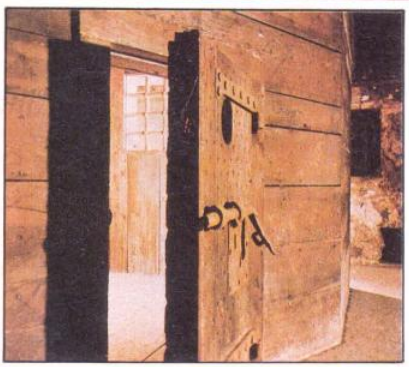

ভেনিসের ডুকাল প্রাসাদের এই ঘরেই বন্দি ছিলেন ক্যাসানোভা

অতলান্তিকের মধ্যসমুদ্রে কোনওক্রমে ভাসতে ভাসতে বন্ধুকে ইশারায় ডাকছেন 'প্যাপিলন' শারিয়ের

কেকের মধ্যে চাবি

কড়া পাহারাকে ফাঁকি দিয়ে পালাবার কত বিচিত্র উপায় যে পলাতকরা মাথা ঘামিয়ে বের করেন, তা ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়। এদের মধ্যে বুদ্ধির খেলায় সবাইকে টেক্কা দিয়েছিলেন আইরিশ নেতা ইমন ডি ভ্যালেরা। ডি ভ্যালেরা বন্দি ছিলেন ইংল্যান্ডের লিঙ্কন জেলে। সেটা ১৯১৯ সালের কথা। তিনি ও তাঁর বিশ্বস্ত সঙ্গীরা জেল থেকে বেরোবার মতলব ভাঁজতে লাগলেন। জেলের প্রহরীদের ফাঁকি দিয়ে একটা ছুঁচও গলার উপায় ছিল না। কিন্তু আইরিশদের বুদ্ধির কাছে শেষ পর্যন্ত হার মানতে হল জেলের রক্ষীদের। ডি ভ্যালেরার কাছে তাঁর পরিচিতরা খাবার পাঠাতেন। এই খাবারের সঙ্গে একদিন পাঠানো হল বেশ বড় একটি কেক। রক্ষীরা ঘুণাক্ষরেও জানতে পারলেন না ওই বেক-করা কেকের মধ্যে লুকনো আছে কিছু গোপন অস্ত্র ও চাবি। ভেতরের জিনিসপত্রের ভারে পাছে কেকটি ভেঙে যায় তাই কেকের গায়ে ছিল প্লাসটার অব প্যারিসের আবরণ। ওই চাবি আর অন্য যন্ত্রপাতির সাহায্যে মুক্তি পেলেন ডি ভ্যালেরা।

করতে-করতে চোখের নিমেষে এসে নামল জেলখানার সামনে। ঠিক এই মুহূর্তটারই অপেক্ষায় থাকা জোয়েল ও কার্লোস ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে গেল হেলিকপ্টারের খোলা দরজার দিকে। দু'জনেরই হাতে ধরা খবরের কাগজ। সাত-আট সেকেন্ডের মধ্যে সকলের চোখের সামনে ওদের তুলে নিয়ে আকাশে উঠে গেল হেলিকপ্টার। হতভম্ব প্রহরীরা যখন বুঝতে পারল, তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। দুর্ভেদ্য জেলের গণ্ডি পেরিয়ে দুই বন্দি তখন ধরাছোঁয়ার বাইরে। জেল থেকে পালানোর এই দুঃসাহসিক পরিকল্পনা কিন্তু অনেক বুদ্ধি খাটিয়ে তৈরি করা হয়েছিল। তখন মেক্সিকোর সরকারি হেলিকপ্টারগুলির রং ছিল নীল। প্রহরীদের সন্দেহ এড়াবার জন্য তাই ব্যবহার করা হয়েছিল নীল রঙের হেলিকপ্টার। পাইলট যাতে সহজেই বন্দি দু'জনকে ঠিকঠাক চিনতে পারেন সেজন্যই দু'জনের হাতে ছিল পাকানো খবরের কাগজ। প্রহরীদের বোকা বানানোর জন্য এই সময় নির্দিষ্ট ছিল মাত্র দশ সেকেন্ড। ওই দশ সেকেন্ডের মধ্যে কাপলান ও কার্লোস হেলিকপ্টারটিতে উঠতে না পারলে তাদের ছাড়াই ফিরে যেত হেলিকপ্টার। মূলত গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগেই বন্দি করে রাখা হয়েছিল কাপলানকে। কিন্তু সে সবসময়ই নিজেকে নির্দোষ বলে দাবি করত। জেলে থাকার সময় আরও তিনবার পালানোর চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছিল সে। সঙ্গী কার্লোসকে নিয়ে চতুর্থবারের চেষ্টায় এল মুক্তি। এই

রোমাঞ্চকর অন্তর্ধান 'দ্য টেন সেকেন্ড ব্রেক আউট' নামে খ্যাত।

অন্তর্ধানের গোড়ার কথা

বন্দি হয়ে থাকতে কেই-বা ভালবাসে ? সবাই চায় মুক্তি আর স্বাধীনতা। বন্দিদশা থেকে নিজেকে মুক্ত করতে প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ অনেক বিপজ্জনক অভিযানে অংশ নিয়েছে। ইতালির কাপুয়ার গ্ল্যাডিয়েটোরিয়াল স্কুল থেকে ৭৩ খ্রিস্টপূর্বাব্দে রোমান গ্ল্যাডিয়েটরদের বিদ্রোহ ও অন্তর্ধান এরকমই একটি অভিযান। রোমান সাম্রাজ্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ যোদ্ধাদের বাস ছিল কাপুয়ার স্কুলটিতে। কিন্তু এই যোদ্ধাদের স্বাধীনতা বলে কিছু ছিল না। যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুর জন্য সবসময় তাদের প্রস্তুত থাকতে হত। এই দাসত্বের জীবন থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য স্পার্টাকাস নামে এক যোদ্ধার নেতৃত্বে তারা পালাবার পরিকল্পনা করল। রক্ষীরা শেষ মুহূর্তে পরিকল্পনাটা জানলেও দু'শোজন বিদ্রোহীর মধ্যে প্রায় সত্তরজন সব বাধা অতিক্রম করে পালিয়ে গেল কাপুয়া থেকে। রোমান সাম্রাজ্যের সৈন্যরা এই পলাতক গ্ল্যাডিয়েটরদের ছেড়ে দিল না। বিরাট বাহিনী তাদের খোঁজার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করল। স্পার্টাকাসের বুদ্ধি আর অভিজ্ঞতার কাছে বেশ কয়েকবার হার মানলেও শেষ হাসিটি হাসল রোমান সৈন্যরাই। তাদের মিলিত শক্তির কাছে পেরে উঠল না স্পার্টাকাসের বাহিনী। মুখোমুখি যুদ্ধে স্পার্টাকাস মারা গেলেন, বাকিদের হত্যা করা হল।

মোজেসের নেতৃত্বে দাসত্ব থেকে নিজেদের মুক্ত করে ইজরায়েলিদের মিশর থেকে পালানোর কাহিনী অন্তর্ধানের ইতিহাসে স্মরণীয়।

মুঘল সম্রাট ঔরঙ্গজেবের কারাগার থেকে ফলের ঝুড়িতে করে কীভাবে পালিয়েছিলেন ছত্রপতি শিবাজি ও তাঁর পুত্র, সে-কাহিনী আমাদের সকলেরই জানা। আর ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে সবচেয়ে বিখ্যাত অন্তর্ধানের কাহিনীর নায়ক যে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। গৃহবন্দি নেতাজি ১৯৪১ সালের জানুয়ারি মাসে কীভাবে ব্রিটিশদের শ্যেনদৃষ্টি ফাঁকি দিয়ে গাড়িতে করে অন্তর্ধান করেছিলেন, তা আজ কারও অজানা নয়।

অন্তর্ধানের সাজসরঞ্জাম

প্রাচীনকালে পলাতকদের সম্বল ছিল উপস্থিত বুদ্ধি, দুর্জয় সাহস আর অদম্য মনোবল। বর্তমান যুগের পলাতকদের এই গুণগুলি তো আছেই, তার ওপর বাড়তি সুবিধে হল নানারকম অত্যাধুনিক উপকরণ। কতরকম

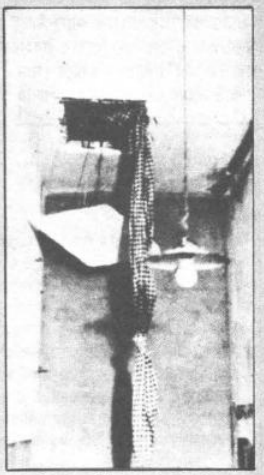

কোলডিৎজ দুর্গে গিঁটবাঁধা এই কাপড় বেয়ে পালিয়েছেন অনেক বন্দি

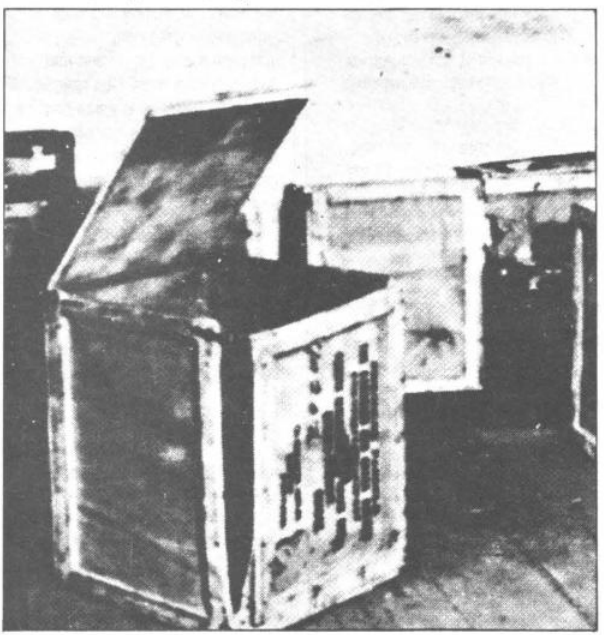

রেড ক্রস-এর এই বাক্সে ঢুকে পালিয়েছিলেন যুদ্ধবন্দি এক ব্রিটিশ অফিসার

ই অ্যান্ড ই

এসকেপ অ্যান্ড ইভেশন। সংক্ষেপে 'ই অ্যান্ড ই'। পলাতকদের দুনিয়ায় খুব চলে কথাটা। ১৯৫০-৫৩ সালের কোরিয়ান যুদ্ধের সময় আমেরিকার পাইলটদের দেওয়া হয়েছিল 'ই অ্যান্ড ই কিট'। অভিনব এই কিটে ছিল প্রয়োজনীয় সব সাজসরঞ্জাম। ঘড়ি আর বল-পয়েন্ট পেন ছাড়াও ছিল বিশেষভাবে তৈরি কম্পাস। আর ছিল রিভলভার ও নগদ দশ ডলার। পাইলটদের পরনে ফ্লাইং স্যুট ছাড়াও ছিল আত্মরক্ষার জন্য বিশেষ পোশাক। কোরিয়ার কনকনে শীতের মোকাবিলার জন্য পায়ে ছিল ইলেকট্রিক বুট। হঠাৎ শত্রুপক্ষের হাতে ধরা পড়ে গেলে দারুণ কাজে আসত 'ই অ্যান্ড ই'।

জিনিস যে ব্যবহার করা হয় অন্তর্ধানের কাজে, তার কোনও হিসেব নেই। কারাগারে বন্দিরা মুক্তির জন্য প্রায়ই চেষ্টা করেন চিঠির মাধ্যমে, তাঁদের মুক্ত সহযোগীদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে। এই চিঠি রক্ষীদের হাতে পড়লেই সব মাটি। তাই বহু পলাতক লেখার সময় ব্যবহার করতেন 'ইনভিজিবল ইঙ্ক' বা 'অদৃশ্য কালি'। কমলালেবুর রস, পাতিলেবুর রস থেকে শুরু করে পেঁয়াজ, দুধ ইত্যাদি থেকেও তৈরি হত এই কালি। ইতালির অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয় পলাতক ক্যাসানোভা মালবেরির রসকে কালি হিসেবে ব্যবহার করতেন আর লিখতেন নখ দিয়ে। জন গেরার্ড নামের এক ক্যাথলিক পাদরি যিনি একাধিকবার প্রোটেস্ট্যান্টদের হাত থেকে পালিয়েছিলেন, ব্যবহার করতেন কমলালেবুর রস। পলাতকদের আর-এক অস্ত্র হল দড়ি। একটুকরো সরু দড়ি দিয়ে অনেক 'এসকেপার' অসাধ্যসাধন করেছেন। বিছানার চাদরের সাহায্যে দড়ি তৈরি করে কাজে লাগানো এসকেপারদের মধ্যে খুবই জনপ্রিয়। উনিশ শতকে যে ব্রিটিশ বন্দিরা ফ্রান্সের বিসে জেল থেকে জীবন বিপন্ন করে পালিয়েছিল, প্রয়োজনীয় দড়ি তৈরি করতে তাদের মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হয়েছিল। শার্টের কাপড়, মোম আর মোটা সুতো দিয়ে তারা বানিয়েছিল দড়ি। প্রথম যিনি 'টাওয়ার অব লন্ডন' থেকে অন্তর্ধান করেন, সেই রানুলফ

এই পোশাকেই পালিয়েছিলেন যুদ্ধবন্দি ক্যাপ্টেন ইনসাল

ফ্ল্যামার্ড ছিলেন ডারহ্যামের বিশপ। দ্বাদশ শতাব্দীর এই অন্তর্ধানের ঘটনা বেশ সাড়া ফেলেছিল। ইনিও পালানোর জন্য দড়ি ব্যবহার করেছিলেন, কিন্তু তার আগে দেখিয়েছিলেন বুদ্ধির খেলা।

এসকেপাররা তালা খোলার জন্য নানা উপকরণ ব্যবহার করেন। এর মধ্যে শক্তিশালী চুম্বক থেকে শুরু করে বৈদ্যুতিক তার পর্যন্ত সবই আছে। আর কোনওভাবে যদি চাবি জোগাড় করা যায়, তা হলে তো সোনায় সোহাগা। সাবানের মধ্যে চাবির ছাঁচ তুলে অবিকল একইরকম চাবি তৈরি করার পদ্ধতি অনেকদিন ধরেই চলে আসছে। এই পদ্ধতিরই সফল প্রয়োগে ১৮৭৩ সালে মেরি মুন নামে একটি মেয়ে নিউ ইয়র্কের সিংসিং জেল থেকে বেশ কিছু বন্দিকে পালাতে সাহায্য করেছিল। মেরিকে পরে পুলিশ অবশ্য ধরে ফেলেছিল। যারা পালিয়েছিল তারা সবাই যে 'হোম রান'-এ সফল হয়েছিল তা নয়। এসকেপারদের জগতে পালিয়ে গিয়ে নিরাপদে নিজের গন্তব্যে পৌঁছনোকেই বলা হয় হোম রান। সফল হোম রানের জন্য কখনও-কখনও লুকিয়ে থাকতে হয় 'সেফ হাউস'-এ। অন্তর্ধানের পর কাছেপিঠেই কোথাও আত্মগোপন করার জায়গাকে বলে সেফ হাউস। MI-9 নামে একটি ব্রিটিশ সংস্থা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মান অধিকৃত ইউরোপের বিভিন্ন জায়গায় এসকেপারদের জন্য সেফ হাউসের ব্যবস্থা

বেলুনে অন্তর্ধান

গল্প নয়, আকাশপথে পালানোর কাজে একাধিকবার সত্যিই বেলুনকে ব্যবহার করা হয়েছে। ১৮৭০ সালে ফরাসিরা বেলুনকে কাজে লাগিয়েছিলেন দারুণভাবে। প্রাশিয়ানরা তখন প্যারিস অবরোধ করে রেখেছে। অবরুদ্ধ ফরাসিরা ঠিক করলেন যেভাবেই হোক পালিয়ে সাহায্য জোগাড় করতে হবে। দেখা গেল দুর্ভেদ্য প্রহরার মধ্যে আকাশপথে বেলুনে পালানোই একমাত্র উপায়। কিন্তু ঝুঁকিটা প্রথমে কে নেবেন এই নিয়ে হল মুশকিল। একে তো আকাশে যে-কোনও সময়ে বেলুন বিগড়ে যেতে পারে, তার ওপর একবার শত্রুপক্ষের চোখে পড়ে গেলে আর রক্ষে নেই। নিমেষে একঝাঁক বুলেটে ঝাঁঝরা হয়ে যেতে হবে। শেষ পর্যন্ত লিঁয় গ্যামবেতা নামে এক অসমসাহসী মন্ত্রী রাজি হলেন দায়িত্ব নিতে। মন্টমার্তে পাহাড় থেকে ৮ অক্টোবর বেলুনে আকাশে উঠলেন গ্যামবেতা। সঙ্গে নিলেন ম্যাপ, কম্পাস, গোপন নথিপত্র আর লাঞ্চ প্যাকেট। প্রথমে সব ঠিকঠাক চলছিল, কিন্তু একটু পরেই হাওয়ার অভাবে বেলুন নামতে শুরু করল। প্রমাদ গনলেন গ্যামবেতা। বেলুনটা দেখে ফেললেন প্রাশিয়ান সৈন্যরা। তাঁদের গুলি একবার প্রায় বেলুন ছুঁয়ে বেরিয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত অবশ্য ভাগ্য সহায় হল। হঠাৎ বেলুন আবার ওপরে উঠতে শুরু করল। শত্রুর নাগাল এড়িয়ে গ্যামবেতা নিরাপদে পারীর বাইরে উড়ে গেলেন। উদ্দেশ্য সফল হল। শুধু গ্যামবেতাই নন, আরও অনেক ফরাসি সে-সময় বেলুনে করে পালিয়ে গিয়েছিলেন শহরের বাইরে। প্রাশিয়ানরা যে হাত-পা গুটিয়ে বসে ছিলেন তা নয়। তাঁরাও বেলুন তৈরি করেছিলেন, যাতে চড়ে আকাশপথে চক্কর দিতেন সৈন্যরা। ফরাসিদের বেলুন দেখলেই গুলি ছুঁড়ে তাকে ধ্বংস করাই ছিল এদের কাজ। তবু এই সৈন্যবাহিনী তেমন সফল হতে পারেননি। পঁয়ষট্টিটি বেলুনের মধ্যে মাত্র পাঁচটিকে তাঁরা আটক করতে পেরেছিলেন।

বেলুনে চেপে অবরুদ্ধ প্যারিস ত্যাগ

করেছিল। সেফ হাউসে নিরাপদে পৌঁছনোর জন্য দরকার হয় ম্যাপ ও কম্পাসের। দাবার বোর্ডের ভেতরে ম্যাপ পাচারের ঘটনাও ঘটেছে। বইয়ের পাতা কেটে অনেক সময় লুকিয়ে রাখা হয় মূল্যবান নথিপত্র, পাসপোর্ট ইত্যাদি। অভিজ্ঞ এসকেপাররা কখনওই সঙ্গে রাখতে ভোলেন না ক্যামেরা ও খাবার কেনার জন্য প্রয়োজনীয় টাকা। এমনও হতে পারে, পালানোর জন্য প্রচুর পরিশ্রম করে শেষে কূলে এসে তরী ডুবল। জার্মানদের হাতে আটক একদল হতভাগ্য বন্দির সেই অবস্থাই হয়েছিল। তিন-চার সপ্তাহ ধরে খেটে সুড়ঙ্গ তৈরি করেছিল বন্দিরা। কিন্তু নির্দিষ্ট দিনে পালানোর জন্য সুড়ঙ্গের মুখে পৌঁছতেই তাদের অভ্যর্থনা জানাল জার্মান সৈন্যবাহিনী।

কয়েকটি দুঃসাহসিক অন্তর্ধান

ইংল্যান্ডের রাজা দ্বিতীয় চার্লস তখন পলাতক। পিতা প্রথম চার্লসকে হত্যা করা হয়েছে। তাঁর নিজস্ব সেনাবাহিনীও উরচেস্টারের যুদ্ধে পরাজিত। হাল না ছেড়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন চার্লস। বিপক্ষ সৈন্যরাও ছাড়বার পাত্র নন। চারদিকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন তাঁরা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বেঁচে গেলেন চার্লস। কখনও কাঠুরে, কখনও রাঁধুনি সেজে দিন কাটাতে লাগলেন তিনি। অনেক কষ্ট সহ্য করে ১৬৫১ সালের ১৫ অক্টোবর কৃষকের ছদ্মবেশে ফ্রান্সের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন তিনি। দশ বছর পরে ইংল্যান্ডের রাজা হিসেবে তাঁর প্রাপ্য সিংহাসন তিনি ফিরে পেয়েছিলেন।

ইতালীয় পর্যটক জিওভানি কাসানোভার অন্তর্ধান ইতিহাস-বিখ্যাত। আঠারো শতকের মাঝামাঝি ভেনিসের ডুকাল প্রাসাদের একটি সেলে বন্দি অবস্থায় দিন কাটাচ্ছিলেন কাসানোভা। ধারালো লোহার টুকরো দিয়ে সেলের মেঝেতে ফুটো করে পালাবার পথ অনেকটা তৈরি করে ফেলার পরই ঘটল বিপর্যয়। এমনই ভাগ্য যে, ঠিক সেই সময়ই অন্য সেলে স্থানান্তরিত করা হল কাসানোভাকে। সব পরিশ্রম বিফলে যেতে বসল। দমে না গিয়ে পাশের সেলে বন্দি বালবি নামে এক সাধুর সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতালেন তিনি। জেলারের মাধ্যমে তাঁরা যেসব বই দেওয়া-নেওয়া করতেন, তাতে অদৃশ্য কালিতে লেখা থাকত গোপন পরিকল্পনা। প্ল্যান অনুযায়ী এক প্লেট খাবারের মধ্য দিয়ে বালবিকে তাঁর লোহার ফলাটা পাঠালেন কাসানোভা। ফলাটিকে কাজে লাগিয়ে নিজের সেলের দেওয়াল ফুটো করে এক রাত্রে কাসানোভার সেলে ঢুকে পড়লেন বালবি। দু'জনে অক্লান্ত চেষ্টায় ওপরের দেওয়ালের একটা বড় অংশ ভেঙে ফেলে ছাদে উঠলেন। কোনওরকমে সকলের নজর এড়িয়ে জানলা টপকে প্রাসাদের একটি ঘরে

অঁরি শারিয়ের : পলাতক এই বন্দি তখন বেস্টসেলার এক লেখক

প্যাপিলন শারিয়ের

'শয়তানের দ্বীপ' ছেড়ে বারবার পালানোর চেষ্টা করেছেন অঁরি শারিয়ের। সবসুদ্ধ ন'বার।

শয়তানের দ্বীপ অর্থাৎ কিনা ডেভিল্‌স আইল্যান্ড। ফরাসি গায়ানার উপকূল থেকে কিছু দূরে, অতলান্তিক মহাসাগরের বুকে ছোট্ট এক দ্বীপ। ভয়ঙ্কর সব অপরাধীকে এখানে দ্বীপান্তরে পাঠানো হয়।

অঁরি শারিয়েরকে এখানে পাঠানো হয়েছিল খুনের অপরাধে। তিনি নাকি নৃশংসভাবে একজনকে হত্যা করেছেন। শারিয়ের অবশ্য এই অভিযোগ বরাবর অস্বীকার করেছেন।

অতলান্তিকের এই নিঃসঙ্গ দ্বীপান্তরে শারিয়েরের বুকে তীব্র এক ক্ষোভের আগুন। বিনা অপরাধে দণ্ডিত হওয়ার ক্ষোভ। এই দ্বীপান্তর থেকে তাঁকে মুক্তি পেতেই হবে।

যে-কোনওভাবে, যে-কোনও উপায়ে!

ন'বার পালানোর চেষ্টা করেও বারবার ধরা পড়েছেন শারিয়ের। পালিয়ে যাওয়ার এই তীব্র আকাঙ্ক্ষার জন্য দ্বীপান্তরের অন্য বন্দিরা তাঁর নাম দিয়েছিলেন 'প্যাপিলন'। অর্থাৎ কিনা, প্রজাপতি!

দশবারের বার গোটা নারকেল ভর্তি বস্তার ভেলা বানিয়ে অতলান্তিকের ঢেউয়ে আছড়ে পড়েছিলেন শারিয়ের। ভাসতে-ভাসতেই শেষ অবধি পৌঁছেছিলেন এল ডোরাডো শহরে। এখন তিনি স্বাধীন! ভেনেজুয়েলার নাগরিকত্ব গ্রহণ করেছেন একদা বন্দি ফরাসি অঁরি শারিয়ের।

শয়তানের দ্বীপ ছাড়িয়ে দুঃসাহসিক এই অন্তর্ধানের অভিজ্ঞতা নিয়েই পরবর্তীকালে একটি বই লিখেছিলেন শারিয়ের। বইয়ের প্রতিটি ছত্রেই তাঁর পলায়নের সেই রোমাঞ্চকর মুহূর্তগুলি ফুটে উঠেছে জ্বলজ্বল করে। জনচিত্তজয়ী, বেস্টসেলার একটি বই।

বইয়ের নাম শারিয়ের নিজেই রেখেছিলেন। দ্বীপান্তরের সেই দিনগুলির কথা মনে রেখে সেই বইয়ের নাম তিনি দিয়েছিলেন 'প্যাপিলন'।

ইতিহাসে ভারতীয়দের অন্তর্ধান

শত্রুর হাত এড়িয়ে পলায়নের রোমাঞ্চকর ঘটনা ভারতেও কম নেই। শিবাজি থেকে আরম্ভ করে অগ্নিযুগের বিপ্লবী বীর বিনায়ক দামোদর সাভারকর পর্যন্ত প্রত্যেকেই কোনও-না-কোনওভাবে শত্রুর চোখে ধুলো দিয়েছেন।

সতেরোজন অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে বখতিয়ার খিলজি নাকি আচমকা ঘিরে ফেলেছিলেন গৌড়ের রাজপ্রাসাদ। তা সত্ত্বেও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েননি। বৃদ্ধ রাজা লক্ষ্মণসেন। খিড়কি দরজা দিয়ে বেরিয়ে চলে এসেছিলেন নদীতে রাখা তাঁর বজরায়। চলে গিয়েছিলেন নবদ্বীপ। নতুন করে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন গৌড়বঙ্গের রাজধানী। মধ্যযুগের ঐতিহাসিক মিনহাজ-উস-সিরাজের বর্ণনায় এ-কাহিনী থাকলেও আধুনিক ঐতিহাসিকরা কেউ-কেউ অবশ্য এ বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন।

ফলের ঝুড়িতে চেপে পালিয়ে গিয়েছিলেন শিবাজি-ও তাঁর পুত্র শম্ভুজি ! মুঘল সম্রাট ঔরঙ্গজেব ঘুণাক্ষরেও ভাবতে পারেননি, 'পার্বত্য মূষিক' এইভাবে বুদ্ধিবলে তাঁর কবল থেকে বেরিয়ে যাবেন।

ব্রিক্সটন কারাগার থেকে সাভারকরকে জাহাজে করে পাঠানো হচ্ছিল ভারতে, বিচারের উদ্দেশ্যে। কিন্তু অগ্নিযুগের বিপ্লবীকে কি অত সহজে ধরা সম্ভব ? জাহাজ মার্সাই বন্দরের কাছাকাছি আসতেই ডেকের পোর্টহোল ভেঙে পালিয়ে গেলেন সাভারকর।

ছদ্মবেশে ব্রিটিশ পুলিশকে বার বার ধোঁকা দিয়েছেন বিপ্লবী রাসবিহারী বসু, শেষে তিনি চলে গেলেন জাপানে। ব্রিটিশ পুলিশের তাবৎ বড়কর্তারাও মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছিলেন অসাধারণ এই 'এসকেপ'-এর ঘটনায়। রডা আর্মস লুণ্ঠন করে অস্ত্রসংগ্রহের উদ্দেশ্যে দেশ ছাড়লেন নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। তারপর আমেরিকা বা মেক্সিকোর পুলিশও তাঁকে ধরতে পারেনি। নরেন্দ্রনাথ তখন সমস্ত পৃথিবীতে মানবেন্দ্রনাথ রায় বা এম. এন. রায় নামে পরিচিত। আর, জার্মান 'ওআন্ডারার' গাড়িতে করে, এলগিন রোডের বাড়ি ছেড়ে নেতাজি সুভাষচন্দ্রের বেরিয়ে যাওয়া ? সেটাও তো আধুনিক ইতিহাসে রোমাঞ্চকর এক দুঃসাহসিক অন্তর্ধান !

এই গাড়িতেই এলগিন রোডের বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন নেতাজি

নামলেন তাঁরা। এবারই আসল কাজ। কাসানোভার সঙ্গে সবসময় থাকত কিছু ধোপদুরস্ত পোশাক। আর থাকত অভিজাত টুপি। সেগুলি পরে কাসানোভা ও তাঁর সঙ্গী রক্ষীদের সামনে দিয়ে প্রাসাদের বাইরে বেরিয়ে গেলেন। এতই নিখুঁত হল অভিনয় যে, রক্ষীরা ফিরেও তাকাল না। প্রাসাদের বাইরে এসে মুক্তির আনন্দে কেঁদেই ফেললেন কাসানোভা।

অন্তর্ধানের ইতিহাসে 'আন্ডারগ্রাউন্ড রেলরোড' একটি উল্লেখযোগ্য নাম। এটি কিন্তু কোনও রেলপথ নয়। আসলে এটি ছিল

সুড়ঙ্গ কেটে পালিয়েছেন অনেকেই। ডানদিকে : সুড়ঙ্গের প্রবেশপথে উল্লসিত এক বন্দি। নীচে : ট্রলি চাপা দিয়ে সুড়ঙ্গের মুখ বন্ধ করে দিচ্ছেন দুই রক্ষী

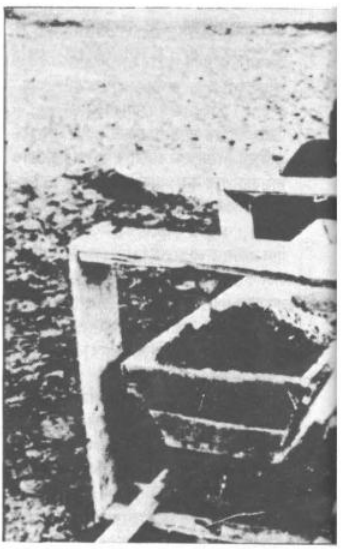

একটি সংস্থা। উনিশ শতকের গোড়ার দিকে ক্রীতদাসদের দক্ষিণ আমেরিকা থেকে উত্তর আমেরিকায় বা কানাডায় পালাতে সাহায্য করাই ছিল এই সংস্থার কাজ। তা হলে সংস্থাটির এমন অদ্ভুত নাম কেন ? নামটি আসলে ছিল একটি এসকেপ-কোড। পালাবার পথকে বলা হত 'লাইন', পলাতকদের বলা হত 'প্যাকেজেস'। এসকেপারদের বিশ্রামের ঘাঁটিগুলি 'স্টেশন' হিসেবে চিহ্নিত ছিল। আর যাঁরা পলাতকদের গাইডের কাজ করতেন, তাঁদের বলা হত

'কণ্ডাক্টর' । পালাবার পথটি ছিল অত্যন্ত দুর্গম । রাত্রেই সাধারণত শুরু হত পলায়ন অভিযান । একটা স্টেশন থেকে পরবর্তী স্টেশনের দূরত্ব ছিল কুড়ি কিলোমিটার । এক রাতের মধ্যেই এক স্টেশন থেকে অন্য স্টেশনে চলে যাওয়া যেত । এসকেপাররা দিনের বেলা স্টেশনগুলিতে লুকিয়ে থাকত । কন্ডাক্টরদের দায়িত্বও কম ছিল না । কোন দল কখন কোন স্টেশনে পৌঁছচ্ছে এই খবরটা সংশ্লিষ্ট স্টেশনে পৌঁছে দেওয়াই ছিল এদের প্রধান কাজ । পুরো ব্যাপারটাই ছিল প্রচণ্ড ঝুঁকির । একবার এই পলাতক ক্রীতদাসদের খোঁজ পেলে হিংস্র কুকুর লেলিয়ে দিত রক্ষীরা । আন্ডারগ্রাউন্ড রেলরোড প্রথম স্থাপিত হয় ১৮১২ সালে । তখন থেকে ১৮৬৫ অবধি এই সংস্থা কাজ চালিয়ে গিয়েছিল । এই সময়ের মধ্যে প্রায় এক লক্ষ ক্রীতদাস মুক্তি পেয়েছিল ।

আমেরিকার গৃহযুদ্ধ তখন তুঙ্গে । আমেরিকার দক্ষিণে লিবি জেলে আটক প্রায় বারোশো বন্দি । এদের মধ্যে অনেকেই মুক্তির স্বপ্ন দেখছেন । সেইমতো চলছে গোপন শলা-পরামর্শ । প্রায় পঁচিশজন বন্দি মিলে একটি সুড়ঙ্গ খোঁড়ার পরিকল্পনা করলেন । জেলের মধ্যেই ছিল 'র‍্যাট হেল' নামে একটি শূন্য কক্ষ । এখান থেকেই শুরু হল খননকার্য । অসহ্য গরমে মোমবাতি জ্বেলে রোজ রাত্রে চলতে লাগল দেওয়াল ভেদ করে সুড়ঙ্গ তৈরির কাজ । সাত সপ্তাহ অমানুষিক পরিশ্রমের পর তৈরি হল চলনসই একটি পালানোর পথ । পথটি বেশি চওড়া নয় । মাত্র একজন মানুষই একবারে যেতে পারেন । আলো-বাতাসের অভাবও ছিল যথেষ্ট । তবু সব বাধা তুচ্ছ করে চলল দুঃসাহসিক মুক্তি অভিযান । পালানোর কথা ছিল প্রায় দু'শো বন্দির, কিন্তু শেষপর্যন্ত সুড়ঙ্গ পেরোতে পেরেছিলেন মাত্র একশো ন'জন । সুড়ঙ্গ পেরোলেও অনেকেই পৌঁছতে পারেননি নিরাপদ জায়গায় । মাত্র আটচল্লিশজন যেতে পেরেছিলেন রক্ষীদের নাগালের বাইরে । ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিলের পালানোর কাহিনী হলিউডের যে-কোনও থ্রিলারের সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার ক্ষমতা রাখে । ১৮৯৯-১৯০২-এর বোর যুদ্ধের সময় একজন সাংবাদিক হিসেবে দক্ষিণ আফ্রিকা গিয়েছিলেন চার্চিল । সেখানে তাঁকে প্রায় বিনা কারণে গ্রেফতার করে বন্দি হিসেবে রাখা হয়েছিল । যুবক চার্চিল তখনও ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী হননি । জেলে থাকাকালীন অন্য দুই বন্দির সঙ্গে পালাবার পরিকল্পনা করলেন । কিন্তু দুর্ভাগ্য, সঙ্গী দু'জন প্রহরীদের নজর এড়াতে ব্যর্থ হল । সবাইকে ফাঁকি দিয়ে চার্চিল একাই জেলের পাঁচিলের কাছে পৌঁছলেন । দ্রুত সিদ্ধান্তও নিলেন তিনি । চার্চিলের নিজের কথায়, "নাউ অর নেভার । আমি দেখলাম, এই সুবর্ণ সুযোগ । পালাতে হলে এখনই যা করার করে ফেলতে হবে । হাতের কাছে পেয়ে গেলাম একটা টুল । সেটার ওপর দাঁড়িয়ে সর্বশক্তি প্রয়োগ করে লাফালাম । ধরেও ফেললাম পাঁচিলের মাথা ।" তারপর ? কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই চার্চিল পৌঁছে গেলেন বোর প্রিজনের বাইরে । এখানেই শেষ নয় । ম্যাপ ও কম্পাস তিনি ফেলে এসেছিলেন জেলে । রাতের অন্ধকারে আকাশের তারাই ছিল পথ চেনার একমাত্র অবলম্বন । প্রায় দু' ঘণ্টা হাঁটার পর দেখা গেল রেলস্টেশনের আলো । অন্ধকারে লুকিয়ে থেকে ট্রেনের অপেক্ষা করতে লাগলেন চার্চিল । যথাসময়ে ট্রেন এল । উঠতে গেলে ধরা পড়া প্রায় নিশ্চিত । ট্রেন যখন সবে গতি বাড়াতে শুরু করেছে, লাইনের ধার দিয়ে ছুটতে শুরু করলেন চার্চিল । প্রাণপণে দৌড়ে প্রচণ্ড ঝুঁকি নিয়ে একসময় উঠেও পড়লেন কয়লা-ভর্তি একটি কামরায় । উপস্থিত বুদ্ধি আর ইচ্ছাশক্তিই

ম্যাজিকের কৌশলে হুডিনি বহুবার মুক্ত করেছেন নিজেকে

মুক্তি এনে দিল অসমসাহসী চার্চিলকে। শুধু সাহস থাকলেই হয় না, এসকেপারদের অনেক সময় দুর্দান্ত অভিনয়ও করতে হয়। যেমন করতে হয়েছিল কার্টরাইট আর হ্যারিসনকে। ১৯১৫ সাল। চলছে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। জার্মানির বার্গ জেলে আরও অনেক ইংরেজ অফিসারের সঙ্গে বন্দি ছিলেন তাঁরা। পালানোর অন্যসব চেষ্টা যখন ব্যর্থ হল, তখন তাঁরা ঠিক করলেন জার্মান অফিসারদের ছদ্মবেশে পালানোই একমাত্র উপায়। শুরু হল ছদ্মবেশে পালানোর প্রস্তুতি। প্রথমেই দরকার ঠিকঠাক মাপের এবং রঙের জার্মান ও ভারকোট, জেলেরই এক বন্দির কাছ থেকে এটা পাওয়া গেল। কোটের ওপর চাই শোল্ডার স্ট্র্যাপ। পোশাক ছিঁড়ে তৈরি হল সেটা। পরের সমস্যা হেড গিয়ার। নিজেদের ব্রিটিশ টুপির মধ্যে শক্ত কার্ডবোর্ড সাঁটা হল। হ্যারিসনের খেয়াল হল হেড গিয়ারে চাই জার্মান ব্যাজ। ব্যাজ তৈরি হল রাংতা আর বোতামের সাহায্যে। জোগাড় করা হল নতুন জুতো। জার্মানদের ধোঁকা দিতে হলে

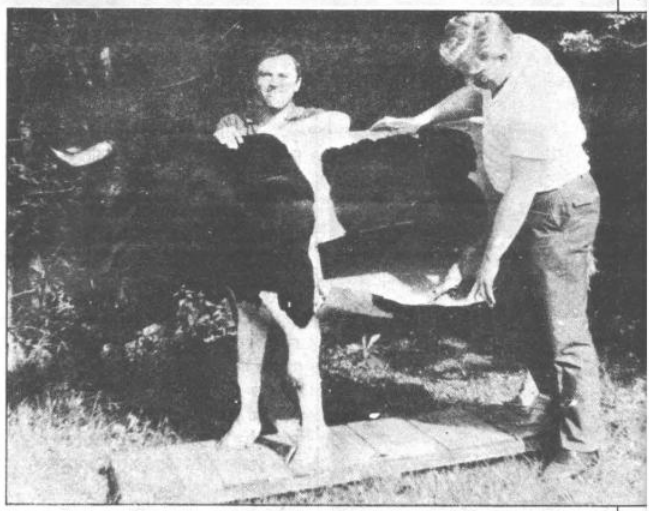

কাঠের এই গোরুর পেটে ঢুকে সীমান্ত পেরিয়েছেন অনেকেই

তরোয়ালও সঙ্গে থাকা চাই। পুরনো প্যাকিং বাক্স থেকে অংশবিশেষ কেটে তরোয়াল বানালেন কার্টরাইট ও হ্যারিসন। শ্যেনচক্ষু জার্মানদের বোকা বানানো অত সোজা নয়। দু'জন বন্দির কারও গোঁফ ছিল না, সন্দেহ এড়াতে গোঁফ রাখলেন দু'জনেই। ১৮ নভেম্বর সন্ধেবেলা ছদ্মবেশধারী দুই বন্দি জার্মান অফিসার সেজে সকলের চোখের সামনে দিয়ে নির্বিঘ্নে জেলের চৌহদ্দির বাইরে চলে গেলেন।

১৯৪০ সালের মে মাস। জার্মানির দুর্ভেদ্য কনিংস্টেইন দুর্গ। দুর্গের চারদিকটা ঘুরে-ঘুরে দেখছিলেন ফরাসি জেনারেল অঁরি জিরো। এই নিয়ে দ্বিতীয়বার তিনি জার্মানদের হাতে বন্দি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ও জার্মানরা তাঁকে কিছুদিন আটকে রেখেছিল। তবে বেশিদিন আটকে রাখা যায়নি জেনারেলকে। জার্মানদের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু এবারে পালানোর কাজটা যেমন ঝুঁকির, তেমনই কঠিন। জিরো ঠিক করলেন, যেভাবেই হোক দুর্গের বাইরে পালিয়ে জার্মান ব্যবসায়ীর ছদ্মবেশে অন্তর্ধান করবেন। কয়েক মাসের মধ্যেই আপ্রাণ চেষ্টায় জার্মান ভাষায় দ্রুত কথা বলা আয়ত্ত করে ফেললেন। ফ্রান্সের বন্ধুদের চিঠি লেখার সময় গোপন কোডে পাঠাতে লাগলেন নির্দেশ। কিছুদিনের মধ্যে মাংসের প্যাকেটের মধ্যে লুকিয়ে পাঠানো হল পঞ্চাশ মিটার লম্বা তামার তার।

বার্লিন-প্রাচীর টপকানোর এইসব দৃশ্য আজ ইতিহাস

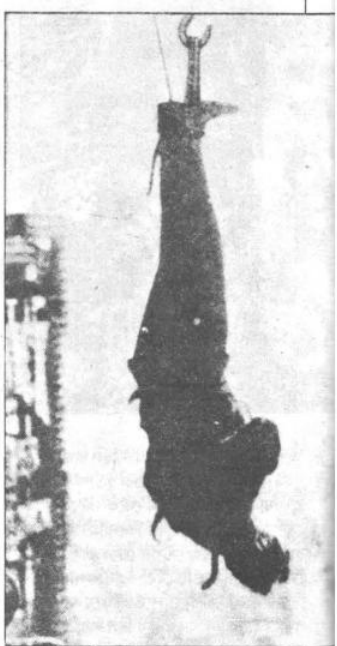

এই অবস্থা থেকেও নিজেকে মুক্ত করেছেন হুডিনি

খাবারের প্যাকেটের সুতো ছিঁড়ে যে লম্বা দড়ি জেনারেল তৈরি করেছিলেন তাকে শক্ত করতে সাহায্য করল এই তার। আর একটি মাংসের প্যাকেটের মধ্যে এল একটি টুপি, যা কাজে লাগবে ছদ্মবেশে। ১৯৪২ সালের এপ্রিলের এক ভোরে জার্মান সৈন্যরা রুটিনমাফিক টহল দিয়ে চলে যাওয়ার পর দুর্গের বারান্দা থেকে দড়ির সাহায্যে দেওয়াল বেয়ে নামতে শুরু করলেন জিরো। খাড়া দেওয়াল বেয়ে নামতে গিয়ে ৬১ বছর বয়সী জেনারেলের হাত-পা রক্তাক্ত হয়ে গেল। হাতের গ্লাভস ছিঁড়ে টুকরো-টুকরো হয়ে গেল। ৫০ মিটার উঁচু একটি টিলার ওপর

কোলডিৎজ দুর্গ থেকে পালাবার জন্য একদল ফরাসি তৈরি করেছিলেন এক আশ্চর্য সুড়ঙ্গ। টানেলটিতে ছিল বৈদ্যুতিক আলো, ছিল ইলেকট্রিক লিফট। এত পরিশ্রম কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিফলে গিয়েছিল।

ছদ্মবেশে বাজিমাত

ব্রিটিশ ক্যাপ্টেন জি.ইনসালের দুঃসাহসিক অন্তর্ধানের পেছনে ছিল ছদ্মবেশের কারসাজি। আর্মির কর্মচারীদের পোশাকের অনুকরণে ছদ্মবেশ নিয়েছিলেন ইনসাল। মাথায় পরেছিলেন সিভিলিয়ান টুপি, গলায় স্কার্ফ। শত্রুর চোখকে ফাঁকি দেওয়ার জন্য এইটুকুই যথেষ্ট ছিল।

মহিলার ছদ্মবেশে পালানোর কাহিনীও পলাতকদের ইতিহাসে অনেক। ফরাসি লেফটেন্যান্ট বোউলে জার্মানদের হাত থেকে পালাবার জন্য সন্ত্রান্ত মহিলার ছদ্মবেশ নিয়েছিলেন। মাথার টুপিটি থেকে শুরু করে পায়ের জুতো পর্যন্ত সবই ছিল নিখুঁত। তবু কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি। ধরা পড়ে গিয়েছিলেন বোউলে।

কিন্তু ধরা যায়নি মহিলার ছদ্মবেশে দুই ফরাসি পলাতককে। মাথায় পরচুলা পরে এঁরা ধোঁকা দিয়েছিলেন রক্ষীদের। ছেঁড়া শার্ট, জ্যাকেট, স্কার্ট, বিছানার কাপড়, পুরনো সুতো ইত্যাদি দিয়ে তৈরি হয়েছিল এইসব পরচুলা। কোনওরকম সন্দেহের অবকাশ ছিল না।

মহিলার সাজে পলাতক দুই ফরাসি সৈনিক

মহিলার ছদ্মবেশে লেফটেন্যান্ট বোউলে

অবস্থিত দুর্গটির দেওয়াল বেয়ে নামা প্রায় দুঃসাধ্য ছিল। মনের জোরে সেই অসম্ভবকেই সম্ভব করলেন জেনারেল। কাছাকাছি স্টেশনে গিয়ে জার্মান ব্যবসায়ী সেজে ট্রেনে উঠলেন জিরো। ইতিমধ্যেই জিরোর পালানোর খবর ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে। ট্রেনে পুরো সময়টাই তাই তাঁকে ভীষণ সাবধানে কাটাতে হল। স্টুটগার্টে জার্মান সৈন্যরা তাঁর কামরাতেও ঢুকল পলাতক বন্দির খোঁজে। কিন্তু তাঁর নিখুঁত অভিনয়ে বোকা বনে গেল ঝানু জার্মান অফিসাররা। দু' সপ্তাহ পরে অবশেষে সুইজারল্যান্ডের সীমানায় পৌঁছে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন জিরো।

কোলডিৎজ দুর্গ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় পলাতকদের কাছে এই নামটি ছিল বিভীষিকা। মালডে নদীর ওপর একটি বিশাল টিলা। তারই ওপরে অবস্থিত এই দুর্গের প্রহরা-ব্যবস্থা ছিল নিশ্ছিদ্র। বাইরের দেওয়ালগুলি দু' মিটারেরও বেশি পুরু ছিল। কোলডিৎজ দুর্গকে বলা হত 'এসকেপ প্রুফ'। কিন্তু এসকেপারদের উদ্ভাবনী শক্তির কাছে হার মানতে হয়েছিল এই দুর্গকেও। কেউ পালিয়েছিলেন ম্যানহোলের তলা দিয়ে, কেউ রেডক্রসের বাক্সে চড়ে গা ঢাকা দিয়েছিলেন। দুর্গ থেকে পালাবার জন্য একদল ফরাসি তৈরি করেছিলেন এক আশ্চর্য সুড়ঙ্গ। টানেলটিতে ছিল বৈদ্যুতিক আলো, ছিল ইলেকট্রিক লিফট। এত পরিশ্রম কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিফলে গিয়েছিল। সুড়ঙ্গটির খোঁজ পেয়ে পালানোর পরিকল্পনা জার্মানরা ব্যর্থ করে দিয়েছিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সবচেয়ে দুঃসাহসিক 'সুড়ঙ্গ-অভিযান' বা 'টানেল ব্রেক-আউট' হয়েছিল জার্মানদের 'স্ট্যালাগলুফত-৩' জেল থেকে। এই টানেল দিয়ে খুব বেশি বন্দি শেষ পর্যন্ত পালাতে পারেননি, কিন্তু টানেলটি সত্যিই ছিল অভিনব এক মাস্টারপিস। প্রবেশপথ ছিল প্রায় দশ মিটার গভীর। খননকার্যের শব্দ যাতে ওপরে না পৌঁছয় তাই টানেল শুরু হয়েছিল জার্মানদের 'সাউন্ড-ডিটেক্টর'-এর রেঞ্জের বাইরে থেকে। যারা খোঁড়ার মূল কাজটা করত, তাদের জন্য সুড়ঙ্গের কাছেই ছিল একটি বড় ঘর। আর ছিল দুটি 'হাফ-ওয়ে হাউস' যার মধ্যে দিয়ে বন্দিরা পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ রাখত। কাজ হত অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে। বন্দিরা নিজেদের মধ্যে 'পিকাডিলি সার্কাস' ও 'লিসেস্টার স্কোয়ার' নামে দুটি কোড ব্যবহার

করত। প্রিজন ক্যাম্পের সরঞ্জাম ব্যবহার করে সুড়ঙ্গে আলোর ব্যবস্থাও করেছিল বন্দিরা। শুধু কি তাই ? বালি আনার জন্য ছিল ট্রলি, গরম এড়াবার জন্য ছিল এয়ার-কন্ডিশনারের ব্যবস্থা। ঠিক ছিল 'টম', 'ডিক' ও 'হ্যারি' নামে তিনটি সুড়ঙ্গপথ দিয়ে শুরু হবে পালানোর অভিযান। প্রতিটির এসকেপ-রুট ছিল আলাদা। শেষ পর্যন্ত ডিককে ব্যবহার করা হয়নি। অন্য সুড়ঙ্গের বালি ডিকে এনে রাখা হত। অভিযানের মাঝপথে টম আবিষ্কৃত হয়। বাকি ছিল হ্যারি। হ্যারির মধ্যে দিয়েই পালিয়েছিল প্রায় ছিয়াত্তরজন। কিন্তু এদের মধ্যে মাত্র তিনজন পৌঁছতে পেরেছিল নিরাপদ জায়গায়। অধিকাংশ পলাতকই ধরা পড়ে এবং নৃশংসভাবে নিহত হয়।

বিশ্বের ইতিহাসে সবচেয়ে বিখ্যাত এসকেপারদের অন্যতম হলেন প্যাপিলন। প্যাপিলনের আসল নাম ছিল অঁরি শারিয়ের। ১৯৩১ সালে খুনের অপরাধে তাঁকে বন্দি করা হয়েছিল। প্যাপিলন অবশ্য খুনের অপরাধে অভিযোগ অস্বীকার করেছিলেন। ফ্রেঞ্চ গায়ানার উপকূল থেকে কিছুদূরে

কুচকাওয়াজে ব্যস্ত আটজন অফিসার। ডানদিকের লোক কিন্তু উধাও। সেখানে নিছক এক পুতুল

নিঃশ্বাস সুগন্ধে ভরায় প্রমিস, দাঁত সুস্থ বানায় প্রমিস।

এযে প্রমিস টুথপেস্টের দান রে।

প্রমিস টুথপেস্টে আছে লবঙ্গ তেলের গুণ ভরে, যা আপনার জন্যে দু'ভাবে কাজ করে - দাঁতের সবই কোণে-ছিদ্রে ঢুকে সেইসব জীবাণুকে নির্মূল করে, যারা আপনার দাঁতের গোড়া কুরেকুরে আলগা করে দেয় - আর নিঃশ্বাসে দুর্গন্ধ জন্মানোর জীবাণুগুলিকে দূর করে আপনার নিঃশ্বাস তাজা সুগন্ধে ভরে।

BALSARA বালসারা – টুথপেস্ট বিশেষজ্ঞ

প্রমিস — লবঙ্গ তেলওলা টুথপেস্ট

CHAITRA · B BLS 951 BEN

অবস্থিত ডেভিলস আইল্যান্ডে নির্বাসনে পাঠানো হয়েছিল তাঁকে। এই দ্বীপটি ছিল এক ভয়ঙ্কর জায়গা। এখানে জেলের বিশাল প্রাচীর ছিল না, ছিল না দিবারাত্র কড়া প্রহরাও। তবু এখান থেকে পালানোর কথা স্বপ্নেও চিন্তা করা যেত না। প্রথম শত্রু ছিল অসম্ভব গরম আবহাওয়া। অনেক বিষাক্ত পোকামাকড় ছাড়াও ছিল দ্বীপের বুকে আছড়ে পড়া অতলান্তিকের উত্তাল জলরাশি। তখনও পর্যন্ত কেউ কোনওদিন দ্বীপ থেকে পালাতে পারেননি। যাঁরা চেষ্টা করেছিলেন তাঁরা হয় গরমে প্রাণ হারিয়েছিলেন, নয় সমুদ্রে চিরকালের জন্য তলিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু প্যাপিলন ছিলেন আর পাঁচজনের চেয়ে আলাদা। সহজে তিনি হার মানতেন না। নারকেল ভর্তি বেশ কিছু বস্তা জোগাড় করে একটা ভেলা তৈরি করে ফেললেন তিনি। তারপর অনেক ভেবেচিন্তে প্যাপিলন দেখলেন যে, প্রচণ্ড বেগে দ্বীপের গায়ে আছড়ে পড়ে যে ঢেউগুলি সমুদ্রের বুকে ফিরে যায়, তার একটাতে ভেলাসুদ্ধু উঠতে পারলে ঢেউয়ের টানেই দ্বীপ থেকে অনেকটা দূরে চলে যাওয়া যাবে। তাড়াহুড়ো না করে ঢেউগুলির আসা-যাওয়া ভালভাবে লক্ষ করলেন তিনি, বেশ কিছুদিন ধরে। তিনি দেখলেন যে, ধেয়ে আসা ঢেউগুলির মধ্যে সপ্তম ঢেউটি সবচেয়ে বড়। প্যাপিলন সিলভেন নামে অন্য এক বন্দির সঙ্গে পরামর্শ করে সপ্তম ঢেউটিকেই পালানোর হাতিয়ার হিসেবে ঠিক করলেন। পরিকল্পনামাফিক রবিবারের এক রাত্রে দু'জনে দমবন্ধ করে সমুদ্রতীরের একটি উঁচু পাথরের ওপর বসে অপেক্ষা করতে লাগলেন জোয়ারের। যথাসময়ে জোয়ার এল। ফিরে যাওয়া সপ্তম ঢেউটির ওপর ভেলা নিয়ে লাফিয়ে পড়লেন তাঁরা। নিমেষের মধ্যে ঢেউটি তাঁদের এনে ফেলল অনেক দূরে। এর পর পুরো একদিন চলল সমুদ্রের সঙ্গে অসম যুদ্ধ। দু'জনে পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেন। দ্বিতীয় দিনে দুপুরবেলা আশার আলো দেখা গেল। ডাঙার কাছাকাছি পৌঁছে গেলেন তিনি। দেখা হল সিলভেনের সঙ্গেও। তখনই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনাটি ঘটল। প্যাপিলনের বারণ সত্ত্বেও অতিরিক্ত উচ্ছ্বাসে তাড়াতাড়ি ডাঙায় নামতে গিয়ে চোরাবালিতে ডুবে গেলেন সিলভেন। আর কোনও বিপদ ঘটল না। বিধ্বস্ত প্যাপিলনকে নিয়ে ভেলা ডাঙা ছুঁল নিরাপদে। নিজের চাঞ্চল্যকর অন্তর্ধানের কাহিনী নিয়ে তিনি 'প্যাপিলন' নামে পরে একটি বই লেখেন। ১৯৬৯ সালে

হিচকক পরিচালিত 'দ্য থার্টি নাইন স্টেপস' ছবির একটি দৃশ্য

সাহিত্যে অন্তর্ধান

পলাতকদের দুঃসাহসিক অভিযান নিয়ে বিশ্বসাহিত্যে লেখা হয়েছে বহু গল্প-উপন্যাস। দ্বিতীয় চার্লসের অন্তর্ধান নিয়ে লেখা হয়েছিল 'দ্য এসকেপ অব চার্লস-২', লেখক রিচার্ড ওলার্ড। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ের দুর্ভেদ্য দুর্গ কোলডিৎজ থেকে বন্দিদের চাঞ্চল্যকর অন্তর্ধানের ওপর ভিত্তি করে পি· আর· রিড লিখেছিলেন 'কোলডিৎজ'। পূর্ব জার্মানি থেকে বার্লিন প্রাচীর টপকে যেসব রিফিউজি পশ্চিম জার্মানিতে পালিয়ে আসতে চেয়েছিলেন, তাঁদের নিয়েই লেখা 'দ্য ইয়েলো পিমপারনেলস'। লিখেছেন এ· স্যান্ড্রেক।

প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক আলেকজান্ডার দুমা-র 'দ্য কাউন্ট অব মন্টেক্রিস্টো' উপন্যাসে অন্তর্ধানের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। রবার্ট লুই স্টিভেনসনের বিখ্যাত উপন্যাস 'কিডন্যাপড'-এর অনেকটা জুড়েই রয়েছে পলায়ন-অভিযান। এ-ব্যাপারে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য অ্যান্টনি হোপের 'দ্য প্রিজনার অব জেন্ডা'। এই বইয়ের কাহিনী অবলম্বনে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছিলেন 'ঝিন্দের বন্দী'। এসকেপ বিষয়ক গল্প-উপন্যাসের মধ্যে আর যেগুলি উল্লেখযোগ্য সেগুলি হল জিওফ্রে ট্রিজের 'দ্য জেন্টেলম্যান অব দ্য সিলড নট', জন বুচারের 'দ্য থার্টি নাইন স্টেপস', ব্যারনেস ওর্কজির 'দ্য স্কারলেট পিমপারনেল' ইত্যাদি।

প্রকাশিত এই বইটি খুব জনপ্রিয় হয়। ১৯৬১ সালে প্রাচীরের মাধ্যমে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়েছিল পূর্ব এবং পশ্চিম বার্লিন। পূর্বের অধিবাসীদের পশ্চিমে যাওয়া বন্ধ করতে পূর্ব জার্মানির শাসকশ্রেণী কড়া ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। রিফিউজি দেখা মাত্রই গুলির নির্দেশ দেওয়া হল রক্ষীদের। কিন্তু আসা ছাড়ল না অনেকেই। রাতের অন্ধকারে রক্ষীদের সামান্য অসতর্কতার সুযোগ নিয়ে পশ্চিমে পৌঁছলেন কয়েকজন। মাংসের ভ্যানে চড়ে গোপনে পশ্চিম বার্লিনে পালিয়ে গেল এগারোটি শিশু এবং তিনজন লোক। কিন্তু বার্লিন প্রাচীরের ইতিহাসে পালানোর জন্য সবচেয়ে বিখ্যাত হল 'টানেল ফিফটি সেভেন'। পশ্চিম বার্লিনের একটি বেকারি থেকে আরম্ভ করে এই বিখ্যাত টানেল ফিফটি সেভেন শেষ হয়েছিল পূর্ব বার্লিনের একটি অ্যাপার্টমেন্টের স্নানঘরে। এই পথে পালিয়েছিলেন মোট সাতান্নজন। তাই নাম টানেল ফিফটি সেভেন। ১৯৬৪ সালের ৪ অক্টোবর এই চালাকিটা ধরা পড়ে যায়। টানেলটি বন্ধ করে দেওয়া হয়। এর ঠিক ২৬ বছর পর ওই ৪ অক্টোবরেই মিলন হল দুই জার্মানির।

গল্প

হিতৈষী

আশাপূর্ণা দেবী

ঘটনাটা বা দুর্ঘটনাটা যাই বলা হোক—ধরা পড়ল ট্রেনখানা হাওড়া স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে দৌড় দিতে শুরু করার পর। অর্থাৎ যখন আর কিছু করার নেই।

অথচ বাড়ি থেকে বেরিয়ে হাওড়া স্টেশন আসার পথে ট্যাক্সিতে ধরা পড়লে, সহজেই প্রতিকার হয়ে যেতে পারত। কারণ তখনও ট্রেন ছাড়ার প্রায় ঘণ্টা সাড়ে তিন দেরি ছিল। অন্য অনেক-অনেক 'বাবু'র মতো শুভঙ্করবাবুরও 'ট্রেনাতঙ্ক' রোগ আছে। রাতের গাড়ি হলেও সকাল থেকেই তাঁর ট্রেন ফেল হওয়ার ভয়ে বুক ধড়ফড় করে, মাথা ঘোরে, আর গিন্নি ও ছেলেমেয়েকে অবিরাম তাড়া দিয়ে চলার প্রেরণা আসে।

তবু এত সত্ত্বেও ট্যাক্সিতে ধরা পড়লে শুভঙ্করবাবু হয়তো ভয়ঙ্কর মরিয়া হয়েই ট্যাক্সিকে পিছু হঠাতেন। কারণ ঘটনাটি যে

ভয়ঙ্কর। কিন্তু দুর্ভাগ্য যে, তখন ধরা পড়ল না। কাজেই শুভঙ্কর ট্যাক্সিড্রাইভারকে জোরে ছোটাবার নির্দেশই দিয়ে চললেন।

তা হাওড়া স্টেশনে ঢুকে পড়েও তো ঘন্টা আড়াই মল্লযুদ্ধে কাটল। তখনও যদি ছাই—কী বলছেন? মল্লযুদ্ধ কিসের? কিসের নয়? কুলির মাথায় মালপত্তর চাপিয়ে তার সঙ্গে দৌড়ের রেস দেওয়া, সামনে টাঙিয়ে রাখা রিজার্ভেশানের লম্বা লিস্টটি থেকে নিজেদের নামগুলো উদ্ধার করে ঠিকঠাক কামরাটিকে শনাক্ত করা, এবং শেষমেশ মানুষ আর মালেরা যথাযথ উঠেছে কিনা তা দেখে নেওয়া, এর কোনটা মল্লযুদ্ধ-তুল্য নয়? সবকিছুর সঙ্গে তো বুক ধড়ফড়ও চলছে।

তবে হ্যাঁ, একসময় অবশ্য যুদ্ধ মিটল।

শুভঙ্কর নিজের রিজার্ভ করা চার-বার্থের ফার্স্ট-ক্লাস কামরাটিতে গিন্নি আর ছেলেমেয়েকে নিয়ে ঢুকে এসে চটপট দরজাটায় লক করে ফেলে একখানা বার্থে গদিয়ান হয়ে বসে বলে উঠলেন, "যাক বাবা। এতক্ষণে নিশ্চিন্দি।"

ফিচেল আর মিচকি দুই ভাইবোনও "কী মজা। গাড়িতে আর কেউ উঠবে না।" বলে চটপট আপার বার্থ দুটোয় উঠে পড়ে পা ঝুলিয়ে বসে পা দোলাতে শুরু করল। গিন্নি সুখলতা খাবারের স্টকটি ঠিকমতো এসেছে দেখে নিশ্চিন্দি হয়ে গুছিয়ে বসলেন। এবং ঠিক তখনই গাড়িটা একটা জোর ঝাঁকুনি দিয়ে দৌড় দিতে শুরু করল দেখে 'দুর্গা দুর্গা, বলে দু' হাত জোড় করে চোখ দুটি বুজলেন। ···শুভঙ্করবাবুর মনে তখনও পর্যন্ত শান্তির বাতাস! প্রাণে আহ্লাদ-আহ্লাদ ঢেউ। কারণ ট্রেন ফেল করেননি।

জামাই নাগপুর থেকে বিলাসপুরে বদলি হয়ে আসা পর্যন্ত বড় মেয়ে ফুচকা অবিরত মা-বাবাকে চিঠি লিখছে, ফিচেল-মিচকির গরমের ছুটি পড়লেই যেন সবাই মিলে একবার বেড়াতে আসেন। ওখানের কোয়ার্টারিটা নাকি দারুণ সুন্দর আর মস্তবড়। তার সঙ্গে আবার বাগান। তা ছাড়া জায়গাটা নাকি নাগপুরের মতো অত ঘিঞ্জি নয়। জিনিসপত্তরও শস্তা।

বারবার বলায় ট্রেনাতঙ্কের রোগী ঘরকুনো শুভঙ্করবাবুরও শুভবুদ্ধির উদয় হয়েছিল, বলে উঠেছিলেন, "ঠিক আছে। লিখে দাও যাচ্ছি।"

তো এই পর্যন্ত সবই ঠিকই চলছিল। কিন্তু যেইমাত্র গিন্নি সুখলতা কপাল থেকে হাত নামিয়ে চোখ খুললেন, শুভঙ্করবাবু প্রশ্ন করে উঠলেন, "বেরোবার আগে নীচে নামার সময় বড় ঘরের দরজায় তালা লাগিয়েছিলে?"

সুখলতা জোর গলায় বললেন, "লাগাইনি আবার? ডবল তালা লাগানো হল তো! তোমার মতো টেনে-টেনে দেখেও নিয়েছি।"

"ঠিক আছে।" কিন্তু পরক্ষণেই একখানি বোমা!

"দরজা বন্ধ করার আগে আলো, পাখা, টিভি, সব বন্ধ করেছিলে তো?"

"আলো! পাখা! টিভি!"

সঙ্গে-সঙ্গে সুখলতার মাথার মধ্যে ঝিমঝিম করে এল। সেই ঝিমনো মাথার মধ্যে একটি দৃশ্য ফুটে উঠল, আলো-ঝকঝক ঘরের মধ্যে সামনের দেওয়ালে টিভির রঙিন পরদায় একটা হাসি-হাসি মুখ ব্রাশ নিয়ে ঘষে-ঘষে দাঁত মাজছে, আর ঘরের জানলার পরদা টেবিলঢাকা জোর বাতাসে উড়ছে, দুলছে।

তালা লাগাবার সময় এই দৃশ্যই ছিল বড় ঘরের মধ্যে।

সুখলতা নিথর পাথর গলায় শুধু বললেন, "আলো! পাখা! টিভি!"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ। কথাগুলো যেন কখনও শোনোনি মনে হচ্ছে!"

এত অপমান সহ্য হয় না।

সুখলতা নিজেকে সামলে নিলেন। জোর গলায় বললেন, "সব কিছু বন্ধটন্ধ করার কথা তো ছিল তোমারই। বলেছিলে না, আমাদের ওপর তোমার বিশ্বাস নেই। ···নিজে ফ্রিজ বন্ধ করলে, রান্নাঘরে গ্যাসের চাবি পরীক্ষা করলে, 'পাম্প চলছে না তো' বলে খোঁজ নিলে···"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, এ-সবই তো করা হয়েছিল। কিন্তু তোমরা তখন ওই ঘরটা ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিলে? মায়ে-মেয়েতে শেষপর্যন্ত টিভির সামনে হুমড়ে পড়ে বসেছিলে না? ···কী? না একটা 'সিরিয়াল' চলছে, মাত্র আর দু-তিন মিনিট বাকি। যেন ওই তিন মিনিট না দেখা হয়ে থাকলে রাজ্য রসাতলে যাবে! জীবন বৃথা হয়ে যাবে। ···উঃ। এই এক নিধি হয়েছে! টিভি। চমৎকার এক বোকা বাক্স। ওদিকে মস্তান বাহাদুরেরা আমার উপকার করতে ট্যাক্সি এনে হাজির করে বসে আছেন। মিটার উঠছে। তাড়া লাগানো।"

ফিচেল পা দোলানো থামিয়ে বলে উঠল, "মস্তান-বাহাদুরেরা আবার কে?"

"কেন? তোমাদের ওই 'ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর', ত্রিমূর্তি। সর্বদা যাঁরা পাড়া আলো

করে রাস্তায় চরে বেড়ান। পাজির পা-ঝাড়া সব।··· আমার দরকারে আমি যাচ্ছি ট্যাক্সি ডাকতে, তোরা ঝাঁপিয়ে এসে পড়লি কী জন্য ? 'মেসোমশাই, ট্যাক্সি লাগবে ? আপনি দাঁড়ান, আমরা দেখছি।'···ব্যস, তক্ষুনি এনে হাজির। যেন পকেটে ভরা ছিল ট্যাক্সি।···অথচ আমি দরকারের সময় এক ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকি।"

সুখলতা বলেন, "তা ভালই তো করেছে।"

"থাক, থাক, আমায় আর ভাল দেখাতে আসতে হবে না।" এই যে ভালর ফল।···এখন ঘটনাটা কী ঘটেছে বুঝতে পারছ ? এই দিন-কুড়ি ধরে বন্ধ ঘরের মধ্যে তোমার ওঁরা, ওই আলো পাখা টিভিরা নাচবেন গাইবেন, ঘুরবেন, জ্বলবেন। কাজেই শেষপর্যন্ত ইলেকট্রিকের তারগুলো গরম হতে-হতে ধরে নাও, তোমার প্রাণের টিভির বারোটা বেজে গেছে। সারা বাড়ির ইলেকট্রিসিটি—হয়তো জ্বলে-পুড়ে খাক হয়ে যাবে। সে আগুনে হয়তো বাড়িটাও—ও হো হো আমি আর ভাবতে পারছি না। আমি এখনই গিয়ে নিভিয়ে দিই গে।"

বলেই শুভঙ্কর হঠাৎ লাফ দিয়ে 'অ্যালার্ম চেনটা' টানতে এগিয়ে যান।

সঙ্গে-সঙ্গে অবশ্য গিন্নি, কন্যে আর পুত্র একযোগে হাঁ-হাঁ করে ওঠে, "ও কী হচ্ছে ? ও কী হচ্ছে ? 'ফাইন' দিতে হবে, তা জানো ? নয়তো পুলিশ কেসে পড়তে হবে।"

শুভঙ্কর তখন ভয়ঙ্কর থেকে প্রলয়ঙ্করে পৌঁছে গেছেন। সেই স্বরে বলে ওঠেন, "ফাইন ! পুলিশ কেস ! মানে ? বিপদের সময় কাজেই না লাগল তো অ্যালার্ম চেন আছে কী করতে ?"

মিচকিকে তখন শুভঙ্কর টিভি দেখা নিয়ে একহাত নিয়েছেন। মিচকি তার শোধ নেয়। বলে ওঠে, "তা তো নিশ্চয়। কিন্তু রেলপুলিশ যখন জিজ্ঞেস করবে 'বিপদ'টা কী, তখন কী বলবে ? 'বাড়িতে আলো-পাখার সুইচটা অফ করে আসতে ভুলে গেছি।'···এ জবাব পেলে নির্ঘাত ধরে নিয়ে গিয়ে হাজতে পুরে দেবে বাবা।"

"হাজতে পুরে দেবে ? মামদোবাজি নাকি ?"

"দিতেই পারে। অকারণ চেন টানা খুব দোষ, তা জানো না ?"

শুভঙ্কর তেজিয়ান গলায় বলেন, "অকারণ ? বাড়িতে কেউ নেই, ইলেকট্রিকের তার জ্বলে যাচ্ছে, তা থেকে কত কী দুর্ঘটনা ঘটতে পারে তার হিসেব আছে ?"

সুখলতা গম্ভীরভাবে বলেন, "ঠিক আছে। তবে টানো। গাড়ি থামাও পুলিশকে 'জোর কারণ'টি দেখিয়ে এই অন্ধকারে জঙ্গলের মধ্যে নেমে পড়ে হাঁটতে-হাঁটতে বাড়ি পৌঁছে সুইচ নিভিয়ে এসো। টানো চেন।"

এ-কথাটা শুনে শুভঙ্কর হঠাৎ নিভে যান। বলেন, "ঠিক আছে। বসে থাকি। হিসেব করো এই কুড়ি দিনে দিনরাত্তিরে আলো-পাখা আর টিভিটা কত ঘণ্টা চলবে।"

শুভঙ্করবাবুর কপাল ! ছেলেমেয়ে দু'জনেই তাঁর বিরোধী পক্ষ। চিরদিন মায়ের সাপোর্টার। তাই মায়ের বেহুঁশের কথাটি উচ্চারণমাত্র করছে না। বরং মেয়ে বলে উঠল, "ইস ! ক্যালকুলেটারটা আনা হয়নি। আনলে এক্ষুনি হিসেব করে ফেলা যেত ক'ঘণ্টা !"

আর সঙ্গে-সঙ্গে ছেলে বলে উঠল, "সেই ঘণ্টাগুলো থেকে অবশ্য লোডশেডিঙের ঘণ্টাগুলো বাদ দিতে হবে। তা ছাড়া টিভি সারারাত সারাদিন চলে না।"

শুভঙ্কর মিইয়ে গিয়েও আবার জ্বলে ওঠেন, "না, চলে না। আমি তো দেখি দিনরাতই ওর সামনে হুমড়ি খেয়ে বসে আছ তোমরা ! আর লোডশেডিং ?···কেন, কাগজে দেখিসনি সেদিন— বিদ্যুৎমন্ত্রী বলেছেন, আর লোডশেডিং হবে না। হলেও দু-পাঁচ মিনিট।"

"সেই কথা বিশ্বাস করেছ তুমি বাবা ?"

"করব না ? খবরের কাগজের কথা বিশ্বাস করব না তো কি তোমাদের কথা বিশ্বাস করব ?···আমি তো চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি পাখার রেগুলেটারটা গরম হতে-হতে জ্বলে গেছে··· ধোঁয়া উড়ছে, পোড়া-পোড়া গন্ধ বেরোচ্ছে—ওঃ। আমি বিলাসপুরে পৌঁছেই ফিরতি কোনও ট্রেনে কলকাতায় চলে এসে আলো,পাখা, টিভিকে বন্ধ করে দিয়ে, আবার সেইদিনই ফিরে আসব। আমার বাড়িটাকে তো আর ধ্বংস হতে দিতে পারি না। পাড়ার লোকে আগুন দেখে দমকলকে খবর দিলেও, রাস্তায় জ্যাম হওয়ার জন্য দমকলের আসতে দেরি হতে পারে। আর এসে পড়ার পরও জলের অভাবে আগুন নেভানো সম্ভব না হতে পারে।"

শুভঙ্কর আপার বার্থ থেকে একটা খুকখুক শব্দ শুনতে পেলেন। এবং দেখলেন সুখলতা আরাম করে শুয়ে পড়লেন। শুভঙ্কর ভেবে পেলেন না, এরা বিপদের গুরুত্বটা বুঝতে পারছে না কেন ? ইলেকট্রিকের ব্যাপার থেকে কী হতে পারে আর না হতে পারে তা জানে না ? শোনেনি কখনও ? নাঃ, তাঁকেই বুঝতে হবে। পৌঁছেই ফের···

কিন্তু সাধে বলা হয়েছে শুভঙ্করের কপাল !

শুভঙ্করের অতবড় বিদ্বান বুদ্ধিমান এঞ্জিনিয়ার জামাইও কিনা বলে উঠল, "মাই

গড ! আপনি আলো পাখা নেভাতে এখনই একবার কলকাতায় ফিরে যেতে চান ? নাঃ, কিছু মনে করবেন না, আপনার মাথার একটু চিকিৎসার দরকার ।"

জামাই হয়ে এই কথা ।

তবে শুভঙ্করের বড় মেয়ে ফুচকা কিন্তু বরাবর বাবার সাপোর্টার । সে বলে ওঠে, "তা ইলেকট্রিক থেকে ভয়ঙ্কর-ভয়ঙ্কর সব দুর্ঘটনা হয়ও তো, বাবা কিছু ভুল বলেননি । ভয়ে ভয়েই যেতে চাইছেন ।"

জামাই বলল, "চাইলেই বা হচ্ছে কী করে ? টিকিট পাচ্ছেন কোথায় ?"

ফুচকা রেগে বলল, "তা হলে অন্য কোনও ব্যবস্থা করো ? বাবা এখানে বেড়াতে এসে খেয়ে-শুয়ে সুখ পাবেন না ।"

জামাই ভেবেচিন্তে বলল, "আচ্ছা তা হলে বাবাকে বলো, ওঁর পাড়ার কোনও চেনা কারও একটা টেলিফোন নম্বর আমায় দিতে, ঘটনাটা জানিয়ে অফিস থেকে একটা ট্রাঙ্ককল করে দিয়ে দেখি যদি তাঁরা কিছু ব্যবস্থা করতে পারেন ।"

শুভঙ্কর গম্ভীর হাস্যে বললেন, "কী করে করবেন ? ট্রাঙ্ককল-এ তো আর বাড়ির বাহান্নটা তালার চাবিগুলো চালান করা যাবে না বাবা । দিনকাল তো জানো ।···বাড়িকে একেবারে নিশ্ছিদ্র দুর্গ করে রেখে আসা হয়েছে । মাছিটি পর্যন্ত ঢোকবার পথ রাখিনি ।"

জামাই হতাশ হয়ে বলল, "তবে আর কী করা ! আমি বলি কি ওটা ভুলে যান । মন থেকে মুছে ফেলুন । মনে হয় ইলেকট্রিক বিলটা কিছু বাড়া ছাড়া আর কিছু হবে না । বেড়াতে এসেছেন আমোদ করে বেড়ান, আরাম করুন, খাওয়াদাওয়া করুন । আপনার মেয়ে তো এই পনেরো দিন আপনাদের কী কী খাওয়াবে তার মেনু করে রেখেছে ।"

শুভঙ্কর আকাশের দিকে চোখ তুলে বললেন, "বেড়াব ! আরাম করব । খাওয়াদাওয়া করব ? তা বলতে পারো । শুনেছি— রোম যখন জ্বলছিল, নিরো তখন বেহালা বাজাচ্ছিলেন ।"

জামাই কষ্টে হাসি চাপতে গিয়ে কাশতে শুরু করে দেয় । সুখলতা বলেন, "কী হল, কাশি হয়েছে নাকি ?"

এই সময় ফিচেল আর মিচকি ছুটতে-ছুটতে বা হাঁফাতে-হাঁফাতে আসে, "কী ? এখনও তোমরা সেই সুইচ নেভানো নিয়ে পচা তর্ক চালিয়ে যাচ্ছ ? মা, দিদির বাগানটা দেখলে না ? দেখবে চলো তো । আমরা ভেবেছিলাম শুধু ফুলের বাগান । ফলেরও বাগান । গিয়ে দেখে হাঁ । আমগাছে ইয়া-ইয়া আম ঝুলছে, লিচুগাছে থোকা-থোকা লিচু ! জামগাছে থোলো-থোলো জাম !··· পেয়ারাগাছে ডাঁশা-ডাঁশা পেয়ারা । বিশ্বাস করতে পারো—বাড়ির বাগানে আমগাছে আম, জামগাছে জাম, লিচুগাছে লিচু !···ওঃ । ভাবা যায় না ! বাবা, দেখবে চলো না ।"

শুভঙ্কর মলিনভাবে বলেন, "তোমরা দেখোগে বাবা !"

বড় মেয়ে কাঁদো-কাঁদো হয়ে বলে, "তা নাওয়া-খাওয়াটাই করবে চলো বাবা ! এত দুঃখে যদিবা এলে···"

তা নাওয়া-খাওয়া অবশ্য করতেই হল । যতগুলো দিন থাকা হল, সেটা চালাতেই হল । এমনকী মেয়ে এই দিন-পনেরো ব্যাপী মহোৎসবের জন্য যা যা মেনু করেছিল, প্লাস তার ওপর মায়ে-মেয়ের মিলিত অবদানের আরও নতুন সংযোজন— সবই গলাধঃকরণ করতে হল শুভঙ্করকে । কারণ টের পাচ্ছেন আড়ালে-আবডালে সকলেই শুভঙ্করের মাথার চিকিৎসা নিয়ে চিন্তাভাবনা করছে ।

করুক । শেষে যা আছে বুঝবে তার ঠ্যালা ।

ক্রমেই তো ছুটির মেয়াদ ফুরোচ্ছে । ফিরতে তো হবেই কলকাতায় । তখন সুখলতা আর তাঁর প্রাণের পুত্তুর কন্যে মিচকি আর ফিচেল গিয়ে দেখবেন কী ঘটে বসে আছে ।···ওঃ, ওই নাম দুটো রাখাই মহা ঝকমারি হয়েছিল । ফিচেল । মিচকি ! কে রেখেছিল ? আর সুখলতাও ! কোনও দুশ্চিন্তার বালাই নেই ! সুখের ঘাটতি নেই । এমনই তো ওই স্বভাব, মেয়ের বাড়িতে এসে আরও সর্বদাই যেন সুখের সাগরে ভাসছেন ।···

আর অভাগা শুভঙ্কর ? তাঁর অবস্থা ? সর্বদাই হাজারটা কাঁকড়াবিছে কামড়াচ্ছে, একশোটা কুকুরে তাড়া করছে, রাস্তায় চলতে-চলতে পিছের কাছে মোটরবাইট ছুটে আসছে, কানের মধ্যে পিঁপড়ে ঢুকে বসে আছে । চোখের সামনে রাশি-রাশি সর্ষেফুল ফুটে চলেছে ।···

যাক । যম-যন্ত্রণার দিন-অবসান হল !

বিলাসপুর থেকে কলকাতাগামী ট্রেনে চড়ে বসল সবাই ।

আর মেয়ে সঙ্গে বিপুল খাদ্যসম্ভার বেঁধে গুছিয়ে দিয়েছিল, তার সদ্ব্যবহারও করা হল । শুভঙ্করও তাঁর অংশগ্রহণ করতে বাধ্য হলেন । কারণ মনে তো জানেন, বাড়ি গিয়ে কিছুই জুটবে না ।

কিন্তু বাড়ি ? সেটা কি আছে ?

কী অবস্থায় আছে ? ঝলসে পুড়ে কালো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ? না, ভেঙে ভেঙে ঘাড় গুঁজে পড়ে আছে ? মোড়ের মাথায় ঢুকতেই শুভঙ্কর চোখ দুটো বুজে ফেললেন !

তারপর ? ট্যাক্সিটা থামতেই মিচকি বলে উঠল,"ও বাবা, তুমি ঘুমিয়ে পড়েছ নাকি ? কত মিটার উঠেছে দ্যাখো । মা ওসব বুঝতে পারে না ।"

শুভঙ্কর চোখ খুললেন । মিটার দেখলেন । তারপর তাকিয়ে দেখলেন । অটুট

অক্ষয় বাড়িটি তাঁর সকালের রোদে ঝলমল করছে। সম্প্রতি রং করানো হয়েছে কিনা। তাই আরও ঝলমল। রং একটু টসকায়ওনি।

সুখলতা ঝঙ্কার দিয়ে বলে উঠলেন, "কী ? পেলে তো সব ? নাকি সব গেছে ? শুধুশুধু ওখানে মেয়েটাকে অশান্তি দিলে।"

ফিচেল বলে উঠল, "বাবা। তোমার বাড়িটা তো দেখছি উপে যায়নি।" আর মিচকি মিচকে হাসি হেসে বলল, "বাবা ! বাড়িটা সত্যি তো ? না স্বপ্ন ?"

অবিশ্বাস্য আনন্দে বিহ্বল শুভঙ্কর গম্ভীর হাস্যে বলেন, "বলতেই হবে ভগবান রক্ষে করেছেন। কথাতেই আছে রাখে কেষ্ট মারে কে !"

বলতে যা দেরি। চোখের সামনে 'ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর' ত্রিমূর্তি ! "কী মাসিমা বেড়িয়ে আসা হল ? এতদিনের জন্য বাড়ি বন্ধ করে গিয়েছেন কোথায় ?"

দেখে শুভঙ্করের হাড় জ্বলে গেল। এই অকালকুষ্মাণ্ড অপয়ারা ওত পেতে বসে ছিল নাকি ?

মাসিমা উত্তর দেওয়ার আগেই মেসোমশাই খেঁকিয়ে ওঠেন, "সে খোঁজে তোমাদের দরকার কী হে ?"

একজন আপনমনে হাতের মাসল্ ফোলাতে-ফোলাতে উদাসভাবে বলে, "নাঃ। দরকার আর কী ? তবে ভাবলাম হঠাৎ কোথায় কী ঘটল যে, বাড়ির মধ্যে আলো পাখা খুলে টিভি চালিয়ে রেখে বাড়িসুদ্ধু সবাই হাওয়া হল ! ব্যাপারটা কী ?"

শুভঙ্কর থমকে বলেন, "বাড়ির মধ্যে কী করে গেছি না গেছি, তোমরা জানলে কী করে ?"

তিনজনের একজন বলল, "টিভিটা তো আলো পাখার মতো নিঃশব্দ প্রাণী নয় মেসোমশাই, তো পর পর দু' রাত দেখে একটু ঘাবড়ে গিয়েছিলাম ! বন্ধ বাড়িতে গান গায় কে ? কথা বলে কে ? ভূত নয়তো ? তারপর বুঝে ফেলে..."

সুখলতা চাবি খুলে বাড়ির মধ্যে ঢুকে গেছেন। এখন শুধু ছেলেমেয়ে আর শুভঙ্কর। শুভঙ্কর বললেন, "শুনলে কোথা থেকে শুনি ?"

"কেন ? রাস্তা থেকেই। গাঁক-গাঁক করে ...খোলা ছিল তো।"

শুভঙ্কর কান পেতে শুনে বলেন, "কই, কোথায় ?"

"আহা, সে কী আর এখনও আছে। মেন সুইচটা বন্ধ করে দিয়ে ম্যানেজ করে ফেলা হয়েছে তো।"

শুভঙ্করের চোখ গোল হয়ে ওঠে। মেন সুইচটা বন্ধ করে ম্যানেজ করা হয়েছে মানে ? কে করেছে ? কীভাবে ?"

তিনজনের আর-একজন তার চাপদাড়িতে হাত বুলোতে-বুলোতে মধুর হাসি হেসে বলে, "এই আমরাই আর কি। ভাবলাম, কবে আসেন ঠিক কী। শুধু-শুধু কেন ইলেকট্রিকের বিলটা বাড়বে—বেচারি কেল্লন মানুষটার।"

"কী ? কী বললে ? আমি কেল্লন ?"

"আহা। ইয়ে আর কি ! এই লঙ্কা, ভাল কথাটা বল না।"

লঙ্কা অমায়িক হাসি হেসে বলল, "মিতব্যয়ী। অর্থাৎ হিসেবি আর কি ! তো জাম্বো বলেছিল, বাড়িটা তো আষ্টেপৃষ্ঠে তালা মারা, লাইনটাই না হয় কেটে দে।... কিন্তু ভেবে দেখা গেল সেটা বেআইনি। বেআইনি কাজ তো আর করা যায় না ? কী বলো ফিচেল ?... তাই মেন সুইচটাই অফ করে দেওয়া গেল।"

"মেন সুইচ অফটা করলে কীভাবে, অ্যাঁ ?"

ফিচেল হতভম্ব হয়ে বলে, "সে তো বাড়ির মধ্যে দোতলায় সিঁড়ির মাথায়। সব তো তালা মারা।"

"ওই তো। তোমরা ভাই এমন প্রিকশান নিয়েছ। দেখলাম, যেন চারদিকে শুধু চোর আর ডাকাতই আছে, যেন পাড়ায় আমরা নেই। দেখব না। তো যাক ! সে একরকম করে হয়ে গেল।"

ওদের ওই তাচ্ছিল্যব্যঞ্জক মুখ দেখে শুভঙ্করের চেহারা আবার প্রলয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। বলেন, "একরকম করে হয়ে গেল মানে ? কীরকম করে হয়ে গেল ? তালাচাবি তো দেখছি সব আস্তই রয়েছে।"

"আঃ, ছি ছি মেসোমশাই, আমরা কি চোর, না ডাকাত ? তাই তালাচাবি ভাঙার কথা উঠছে। ওসব বেআইনি কাজের মধ্যে লঙ্কা-পটকা নেই বুঝলেন ? কর্তব্যের খাতিরে যেটুকু দরকার তাই করা হয়। ব্যস।... পাশের প্যাসেজের পাঁচিলটা ডিঙিয়ে বাড়ির মধ্যে ঢুকে আসা তো আর শক্ত ব্যাপার কিছু না। ছেলেবেলায় বল পড়লে, ঘুড়ি কেটে এসে পড়লে, কত অমন পাঁচিল টপকে ঢুকে এসেছি।...হ্যাঁ। তারপর অবশ্য একটু খাটুনি ছিল। রেনওয়াটার পাইপ বেয়ে ছাতে উঠে পড়া !"

"কী ? কী ? পাইপ বেয়ে ছাতে উঠেছিলে ?"

পটকা চুলে হাত বুলোতে-বুলোতে বলে, "তা ছাড়া আর কোনও পথ খোলা রেখেছিলেন আপনি ?"

"ছাতে উঠেই বা কী কাঁচকলা হল ? অ্যাঁ ? ছাতের দরজায় তো ভেতর থেকে লোহার খিল লাগানো ছিল।"

"লোহার খিল !"

লঙ্কা বলে, "ও হ্যাঁ তা ছিল বটে। তবে ওটা কোনও ব্যাপার নয়। দরজাটার দুটো কপাটের মাঝখানে একটা পাতলা লোহার পাত ঢুকিয়ে একটু চাড় দিতেই তো একটু ফাঁক হয়ে গেল। তারপর আর-একটু চাড় দিয়ে খিলটা উঠিয়ে নামিয়ে ফেলা। খুবই সিম্পল ব্যাপার। ব্যস, জানিই তো ক'টা সিঁড়ি নেমে গেলেই উঁচু দেওয়ালে আপনার মেন সুইচের মিটার বক্স !"

"জানো ? অ্যাঁ ?"

শুভঙ্কর তাঁর আশি কেজি ওজনের শরীরটা নিয়েও তুড়িলাফ খান। "বলি জানলে কী করে ? আমার বাড়িতে কোথায় কী আছে জানলে কী করে হে মস্তানরা ?"

"দেখুন মেসোমশাই। ওইসব মস্তান-মস্তান বলবেন না। মেজাজ খিচড়ে যায়। একেই তো হাতের কাছে একটা টুল-ফুল কিছুই রেখে যাননি। পটকাটা আমার কাঁধে পা দিয়ে উঠে তবে···"

"তবে তো আমার মাথা কিনেছ ! ইচ্ছে করলে তো তোমরা আমার ঘরেটরে ঢুকে আলমারি সিন্দুকও খুলতে পারতে।"

লঙ্কা আবার নিরীহভাবে মাসল ফোলাতে-ফোলাতে বলে, "ইচ্ছে করলে অবশ্য অসম্ভব হত না।"

"অ্যাঁ। নিজে মুখে কবুল করছ ? তোমরা তো দেখছি সাঙ্ঘাতিক ডেঞ্জারাস ছেলে। তোমাদের আমি পুলিশে দিতে পারি, তা জানো ?"

"আঃ বাবা, কী হচ্ছে ?"

ফিচেল রেগে ওঠে। শুভঙ্কর দমেন না। কড়া গলায় বলেন, "যা বলছি ঠিকই বলছি। খুব তো সাউখুড়ি দেখাচ্ছিলে বেআইনি কাজ করি না। একে কী বলে। অ্যাঁ ? খুব আইনি ? যে বাড়িতে আমি মাছি ঢোকবার পথ রেখে যাইনি সেই বাড়ির মধ্যে ঢুকে তোমরা—একে কী বলে জানো ? অনধিকার প্রবেশ। তোমাদের আমি জেল খাটাতে পারি। ঘানি টানাতে পারি তা জানো ?"

"উঃ, মাথাটা একেবারে গেছে।"

বলে ফিচেল গটগট করে কোনদিকে যেন চলে যায়। আর মিচকি চেঁচাতে-চেঁচাতে বাড়ির মধ্যে ঢুকে যায়, "মা, ও মা, শিগগির এসো। বাবা লঙ্কাদা জাম্বোদাদের পুলিশে দিতে চাইছে। জেল খাটাবে বলছে।"

"কী ? কী বলা হচ্ছে ?"

সুখলতা আঁচলে ভিজে হাত মুছতে-মুছতে বেরিয়ে আসেন, এইসব সোনারচাঁদ হিতৈষী ছেলেদের তুমি পুলিশে দেবে ? জেল খাটাবে ? তা বলবে বইকী ! সাধে কি আর বলেছে কলিতে কারও ভাল করতে নেই। তোমার এই বাড়িখানা পুড়ে ভস্মসাৎ হয়ে যেত, তুমি সর্বস্বান্ত হয়ে যেতে। সেই দুর্ঘটনা থেকে এরা তোমায় রক্ষা করল, তা ভেবে দেখেছ ? এরা নিজেরা রিস্ক নিয়ে এটা না করলে ফিরে এসে আমাদের পথে বসতে হত না ?··· অথচ এদের দৌলতে সব একদম ঠিকঠাক। এসেই টিভিটা খুলে দিলাম। দেখি দিব্যি চলছে।··· তোমরা কিছু মনে কোরো না বাবা !··· তোমাদের মেসোমশাইয়ের কথা বাদ দাও।··· আমাদের এতটা উপকার করলে তোমরা, আমার কাছে একদিন খেতে হবে। আমি নিজে রেঁধে খাওয়াব। কবে খাবে আর কী খাবে বলো ?"

শুভঙ্করের মাথার মধ্যে দাউদাউ করে আগুন জ্বলতে থাকে, গায়ে শত-শত বিছে কামড়ে ওঠে।··· ওঃ। এর থেকে ঢের ভাল ছিল যদি সত্যিই এসে দেখতেন তাঁর এই বাড়িখানা আসবাবপত্তর সমেত পুড়ে কয়লা হয়ে বসে আছে। ···যাঁকে এরকম ঘরভেদী বিভীষণ নিয়ে বাস করতে হয়, বাড়িতে তাঁর দরকারই বা কী ?

দাঁত কিড়মিড় করতে-করতে টক ঝাল তেতো গলায় বলে ওঠেন, "হ্যাঁ বাবা সকল ! বলে যাও, মাসিমার হাতে কী খাবে ? ফায়েড রাইস, না লুচি, পাঁঠার মাংস, না মুরগি। মুড়ো দিয়ে মুগের ডাল, না নারকেল দিয়ে ছোলার ডাল। বলে যাও।"

বলে এমন একখানা দৃষ্টি হেনে দুমদাম করে বাড়ির মধ্যে ঢুকে গেলেন, সেকাল হলে নিশ্চয় ছেলে তিনটে ঝলসে পুড়ে কাঠ কয়লা বনে যেত। কিন্তু কালটা তো সেকাল নয়, তাই ওই তিনখানি সোনারচাঁদ ছেলে, জলজ্যান্ত দাঁড়িয়ে থেকে সোনা হেন মুখে ঘাড় চুলকে অমায়িক হিতৈষীর গলায় বলে, "মুরগি-ফ্রায়েড রাইসই ভাল। লুচিফুচি করতে গেলেই ময়দাফয়দা মাখা ! ফর নাথিং আপনার কষ্ট !"

ছবি : দেবাশিস দেব

টাকাকড়ি

প্রাক-মৌর্য ভারতের সীমানা অঞ্চলের বিদেশি মুদ্রা (২)

প্রাক-মৌর্য যুগে ভারতীয় উপমহাদেশের সীমানা অঞ্চলে বিদেশি মুদ্রার প্রচলন সম্পর্কে লিখেছেন ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

পার্সিপোলিসে মুদ্রার ব্যবহারের হার ক্রমে-ক্রমে বাড়ানো হয়েছিল। সুতরাং অনুমান করা স্বাভাবিক যে, সাম্রাজ্যের সর্বত্র বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে দারিক ও সিগলস ব্যবহৃত হত। কিন্তু তা হলে প্রথম দারয়বৌশ কেন তাঁর সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রদেশ বা অঞ্চল থেকে প্রতি বছর প্রাপ্য কর (বা নজরানা) মুদ্রায় না নিয়ে নির্দিষ্ট ওজনের সোনা বা রুপায় (এবং কয়েকটি ক্ষেত্রে তৎসহ নির্দিষ্টসংখ্যক ঘোড়া বা খোজা বালক বা শস্য ইত্যাদির হিসাবে) নিতেন ? হেরোডোটাসের সাক্ষ্য অনুযায়ী এর জন্য রুপার ওজন ধরা হত ব্যাবিলনীয় ট্যালেন্টের ওজন অনুযায়ী (১ ট্যালেন্ট=৬৫৪৯০ অথবা ৩২৭৪৫ গ্রাম ?) এবং সোনার ওজন ধরা হত ইউওবিয়ার ট্যালেন্টের ওজন অনুসারে (১ ট্যালেন্ট=৮·৫ গ্রাম ?) (হেরোডোটাস, ইতিহাস,৩৮৯ ইত্যাদি, B. Head, Historia Numorum XXXVIII; C. Seltman, Greek Coins, 2nd edition/ p. 5 । সম্রাট কেন নিজের টাঁকশালে তৈরি টাকায় কর নিতেন না ? এর থেকে মনে হয় যে, সাম্রাজ্যের সর্বত্র সরকারি মুদ্রা সব ধরনের লেনদেনের ব্যাপারে গ্রহণীয় ছিল না।

আর-একটা কথা। পারস্য সাম্রাজ্যের সীমানাভুক্ত অনেক জায়গায় (যেমন সুসা, টাইগ্রিস নদীর তীরবর্তী একটি অঞ্চল, চমান-ই-হুজুরি ইত্যাদি) যেসব গ্রিক মুদ্রা সহ প্রাচীন ভান্ডার আবিষ্কৃত হয়েছে সেই মুদ্রাগুলির তারিখের সাক্ষ্য অনুযায়ী ভান্ডারগুলি খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকে পুঁতে ফেলা হয়েছিল বলে মনে হয়। সুতরাং ওইসব ভান্ডারে আবিষ্কৃত বিভিন্ন গ্রিক রাজ্যের মুদ্রা ওই সময় অবধি সাম্রাজ্যের চালু ছিল বলে মনে করা যেতে পারে। ইউরোপীয় গ্রিক রাজ্য থেকে আমদানি বা সাম্রাজ্যের সীমানাভুক্ত ভূতপূর্ব গ্রিক জাতীয় নৃপতিদের

পারস্য সাম্রাজ্যে বিনিময় মাধ্যমের ব্যবস্থা ছিল একটু জটিল। সরকারি মুদ্রা ছাড়াও কোনও কোনও অঞ্চলে প্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত নির্দিষ্ট ওজনের ধাতব খণ্ড বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত হত।

রাজ্যে তৈরি এইসব মুদ্রা বোধ হয় তাদের প্রকৃত মূল্যের ভিত্তিতে বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত হত। এগুলির অনুকরণে সাম্রাজ্যের সীমানার মধ্যেই বেসরকারিভাবে নূতন মুদ্রা তৈরির সম্ভাবনাও অস্বীকার করা যায় না। এই সম্পর্কে আলোচনা পরে করা হবে।

এগুলি ছাড়াও ছিল নির্দিষ্ট ওজনের ধাতব খন্ডের ব্যবহারের সম্ভাবনা। হামাদানের নিকটবর্তী নুস-ই-জানে এইরকম রুপার পাত পাওয়া গেছে।

এইসব তথ্যের ভিত্তিতে বলা যায় যে, পারস্য সাম্রাজ্যে বিনিময় মাধ্যমের ব্যবস্থা ছিল একটু জটিল। সরকারি মুদ্রা ছাড়াও কোনও-কোনও অঞ্চলে প্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত নির্দিষ্ট ওজনের ধাতব খন্ড বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত হত। আরও অনেক অঞ্চলে গ্রিক মুদ্রা তাদের প্রকৃত মূল্যে গ্রহণযোগ্য ছিল। এ ছাড়া অতি প্রাচীন পণ্যবিনিময় প্রথার অস্তিত্বের সম্ভাবনাও একেবারে অস্বীকার করা যায় না।

তবে এই সত্ত্বেও সোনার দারিকের খ্যাতি ছিল অপরিসীম এবং সাম্রাজ্যের বাইরে গ্রিক জগতের কাছেও লোভনীয়। এই প্রসঙ্গে একজাতীয় দারিকের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এগুলির গৌণ দিকে নকশা (বা অক্ষর ?) সহ খাঁজ মুখ্য দিকে মুকুট ও লম্বা পোশাক পরিহিত সম্রাটের প্রতিমূর্তি দেখা যায় অর্ধেক দৌড়নো ও অর্ধেক হাঁটু মুড়ে বসা ভঙ্গিতে এবং তীরসহ ধনু এবং বর্শা বা ছোরা হাতে। অনেকগুলি মুদ্রায় গ্রিক অক্ষরে লেখা S, S, T, A [=সুদ্দও (অর্থাৎ দুই) স্টেটার] এবং M, N, A [=মিনা]। এই মুদ্রাগুলি দুই স্টেটার বা স্বর্ণমুদ্রার অর্থাৎ দুই দারিকের মূল্য বা ওজনের এবং ১ রৌপ্য মিনার মূল্যের সমান। গ্রিক জগতে স্বর্ণমুদ্রা স্টেটার নামে পরিচিত ছিল। অনেক বিশেষজ্ঞের মতে দুই দারিকের ওজনের সমান ওই মুদ্রাগুলি শেষ হখামনিশীয় **সম্রাট** তৃতীয় দারয়বৌশের। অনেকে আবার ওগুলিকে পারস্য সাম্রাজ্য পতনের পরে আলেকজান্ডারের নিযুক্ত প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের বা তাঁদের ওত্তরাধিকারীদের টাঁকশালে তৈরি বলে মনে করেন। মুদ্রাগুলিকে দারিক না বলে স্টেটার নামে উল্লেখ, এদের ওপরে গ্রিক অক্ষরের ও গ্রিক চিহ্নের উপস্থিতি দ্বিতীয় ধারণাকে সমর্থন করে।

এই ধারণাকে সমর্থন করলে স্বীকার করতে হবে যে, কেবলমাত্র পারস্য সাম্রাজ্যেই নয়, সমসাময়িক গ্রিক জগতেও পারসিক মুদ্রা ব্যবস্থার বা সোনার দারিকের মূল্য ছিল।

প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম সাম্রাজ্যিক মুদ্রাব্যবস্থার প্রবর্তন হয় পারস্য সাম্রাজ্যে, অবশ্য এই মুদ্রাব্যবস্থা চলাকালীনই গ্রিক জগতে এথেনীয় সাম্রাজ্যের মুদ্রা ব্যবস্থার প্রসার ঘটেছিল। (ক্রমশ)

Amela—4 (28.11.90)

8-28

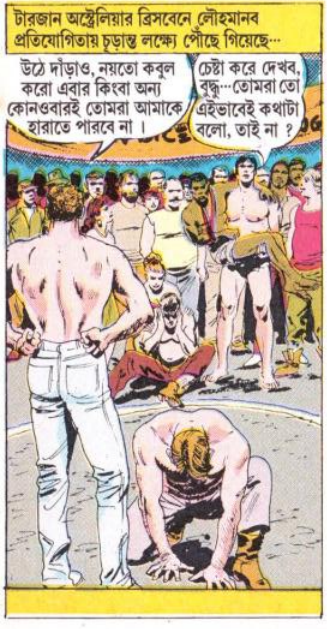

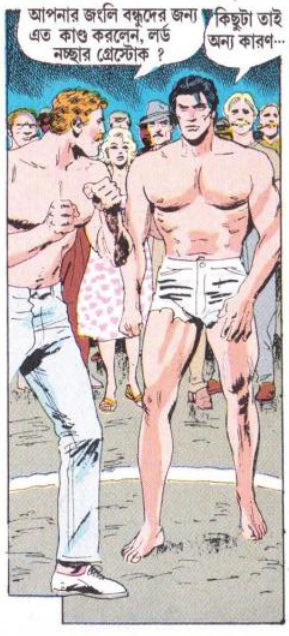

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

পক্ষিবিজ্ঞান

সবচেয়ে ছোট পাখি

পাখিদের মধ্যে সবচেয়ে ছোট হল হামিংবার্ড। দুরন্ত, ছটফটে এই পাখিদের কথা লিখেছেন **পৌলমী সেনগুপ্ত**

ফুলের মধু খেতে ভালবাসে ছোট্ট হামিংবার্ড

দক্ষিণ আমেরিকার কিউবার অভ্যন্তরে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে কুমিরে ভরা জলা অঞ্চল। জলাভূমির চারপাশের জঙ্গল কোথাও-কোথাও বেশ গভীর। কুমির ছাড়াও এখানে আছে আরও নানা বিপদ। আডভেঞ্চার করার পক্ষে আদর্শ জায়গা। কিউবার এই অঞ্চল, স্বাভাবিকভাবেই প্রাণিবিজ্ঞানীদের কাছে আকর্ষক। আজ অবশ্য আমরা অন্য প্রাণীদের কথা ছেড়ে এখানকার এমন একটি পাখির কথা বলব, যাকে প্রাণিজগতের অন্যতম বিস্ময় বলা যেতে পারে। এই পাখিকে তাই বলা হয়ে থাকে 'ডানাওয়ালা রত্ন' বা 'জুয়েল অন উইংস'। এর আসল নাম কিন্তু 'হামিংবার্ড'। প্রাণিবিজ্ঞানীদের ধারণা, পৃথিবীতে প্রায় ৮৬০০টি বিভিন্ন ধরনের পাখি পাওয়া যায়। এর মধ্যে আছে এমু, পেঙ্গুইন বা আলবাট্রসের মতো বিশাল আকারের পাখি। এদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে ছোট পাখি

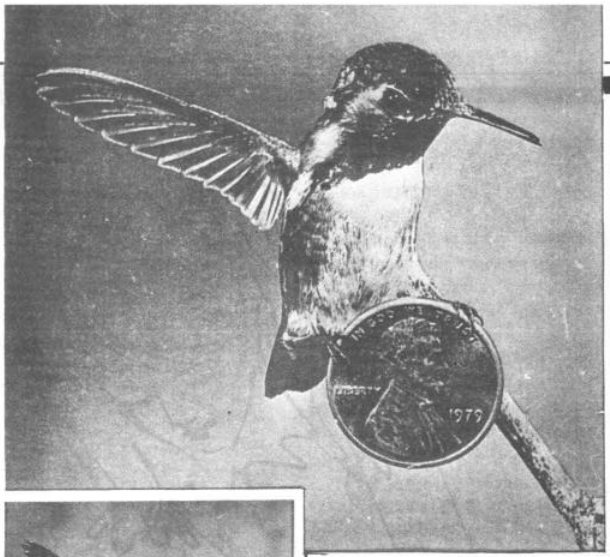

সামান্য একটি পেনিও ওজনে হামিংবার্ডের চেয়ে ভারী

পেনসিলের ডগায় স্বচ্ছন্দে বসতে পারে এই পাখি

হামিংবার্ড। শুনলে অবাক হতে হয়, কোনও কোনও হামিংবার্ডের ওজন মাত্র দু' গ্রাম। এই ক্ষুদ্রতম প্রজাতির হামিংবার্ডই বাস করে কিউবার জলাভূমি অঞ্চলে।

পশ্চিম গোলার্ধের কানাডা থেকে শুরু করে মধ্য আমেরিকা এবং দক্ষিণ আমেরিকার ম্যাগেলন প্রণালী পর্যন্ত যে বিস্তৃত ভূভাগ, তাতে ছড়িয়ে আছে প্রায় ৩০০টি বিভিন্ন প্রজাতির হামিংবার্ড।

আমাদের দেশের মৌটুসি পাখির মতো হামিংবার্ডের প্রধান খাদ্য ফুলের মধু। যে বনভূমিতে এদের বিচরণ, সেখানে ফুলের অভাব হয় না। ফুলের ভেতর থেকে মধু সংগ্রহের জন্যই এই পাখির ঠোঁট বেশ লম্বা। এরা সাধারণত লাল বা অন্য উজ্জ্বল রঙের ফুল পছন্দ করে। প্রত্যেকটি হামিংবার্ডের ঠোঁটের আকার কিন্তু একরকম হয় না। কারও ঠোঁট সোজা আর লম্বা, কারও বা সরু আর বাঁকানো। ঠোঁট যেমনই হোক, মধু সংগ্রহ করতে কিন্তু এদের কোনও অসুবিধে হয় না। এরা নিজেদের পছন্দমতো একটি ফুল বেছে নেয়। এদের পছন্দসই ফুলগুলো সাধারণত লম্বা আকৃতির হয়, কারণ তাতে ঠোঁট ফুলের মধ্যে ঢোকাবার সুবিধে হয়। ঠোঁটের ভেতর থাকে একটা লম্বা জিভ, যার আকৃতি অনেকটা ফাঁপা নলের মতো। সুতরাং স্ট্র দিয়ে শরবত খাওয়ার মতো হামিংবার্ডরা মজা করে জিভ দিয়ে ফুলের মধু মুখে টেনে নেয়। অবশ্য কোনও-কোনও প্রজাতির হামিংবার্ডের জিভের সামনের অংশ হয় বুরুশের মতো। এতে মধু খাওয়ার কাজে কোনও বাধা পড়ে না, উপরন্তু জিভের ডগা দিয়ে ফুলের ভেতর লুকিয়ে থাকা পোকামাকড়ও ধরে খাওয়া যায়। হামিংবার্ড শুধু যে মিষ্টি মধুই খায় তা নয়, ছোটখাটো পোকাতেও এদের অরুচি নেই।

ভাবলে অবাক হতে হয় যে, ছোট্ট এই হামিংবার্ডই হল পৃথিবীর একমাত্র পাখি, যে পেছনদিকেও সমান দক্ষতায় উড়তে পারে। এই পাখিদের নাম হামিংবার্ড বা গুঞ্জন করা পাখি কেন হয়েছে জানো ? প্রচণ্ড গতিতে ডানা নাড়ানোর ফলে এরা সৃষ্টি করে মৌমাছির মতো গুনগুন শব্দ। এই শব্দের জন্যই একে হামিংবার্ড বলা হয়।

হামিংবার্ডের বাস প্রধানত গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলে। অবশ্য কানাডার মতো শীতপ্রধান দেশেও এদের দেখা যায়। মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা এদের খুব বেশি। আমাজন নদীর স্যাঁতসেঁতে অববাহিকা হোক অথবা আন্দিজের উঁচু পার্বত্য প্রদেশ—এদের জীবনীশক্তিতে কোনও পার্থক্য লক্ষ করা যায় না। হামিংবার্ডের কোনও-কোনও প্রজাতি পরিযায়ী। কানাডার সবচেয়ে উত্তরে যারা বসবাস করে, শীতের সময়ে তারা দক্ষিণে উড়ে আসে আর মধ্য আমেরিকার উষ্ণ অঞ্চলে বাসা বাঁধে। আমরা অনেকেই জানি যে, সাইবেরিয়ার পাখিরা শীতকালে হাজার-হাজার মাইল পথ অতিক্রম করে ভারতে চলে আসে, আবার গ্রীষ্মকালে ফিরে যায়। ঠিক তেমনভাবেই হামিংবার্ডরা মেক্সিকো, ফ্লোরিডা বা কিউবার ওপর দিয়ে উড়ে যায় আর খুঁজে নেয় নিজের পছন্দসই জায়গা। পরিযায়ী হামিংবার্ড গোষ্ঠীর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 'রুফাস হামিংবার্ড' বা 'রুবি থ্রোটেড হামিংবার্ড'।

হামিংবার্ডদের মধ্যে সবচেয়ে বড় আন্দিজের হামিংবার্ড। এই পাখিরা ২১ সেন্টিমিটার পর্যন্ত লম্বা হয়। সবচেয়ে ছোট প্রজাতির পাখির নাম 'বি-হামিংবার্ড'। এরা লম্বায় মোটামুটি ৫ সেন্টিমিটার হয় (ঠোঁট ও লেজসহ) এবং ওজন ২ গ্রাম।

হামিংবার্ডের গলা বেশ কর্কশ এবং স্বভাবেও এরা যথেষ্ট ঝগড়াটে। কথায়-কথায় নিজের বীরত্ব প্রকাশ করতে চায়। হয়তো এই কারণেই আজটেক সভ্যতার মানুষ এই পাখির নামে তাদের এক যুদ্ধের দেবতার নাম রেখেছিল।

হামিংবার্ডের বাসার আকৃতি অনেকটা পেয়ালার মতো। বাসা তৈরির জন্য করা হয় গাছের সূক্ষ্মতম তন্তু এবং দরকার পড়লে মাকড়সার জাল। উপাদানগুলি মুখের লালা দিয়ে জোড়া দেওয়া হয়। বাসাতে দুটি ডিম ধরে। হামিংবার্ডের ডিম সাদা, আকারে কফি-বীজের থেকেও ছোট। এই ডিমই প্রকৃতির ক্ষুদ্রতম পাখির ডিম।

এত বিশেষত্ব আছে হামিংবার্ডের, কিন্তু দুঃখের বিষয়, এদের সংখ্যা প্রতিদিনই কমে যাচ্ছে। এই পাখিরা দলবদ্ধভাবে না থেকে একা থাকতেই পছন্দ করে। এই কারণে বহু খোঁজাখুঁজির পর একটা পাখিকে দেখতে পাওয়া যায়। এই পাখিদের কিউবার সরকার 'সংরক্ষিত প্রজাতি' ঘোষণা করেছেন। তা সত্ত্বেও গভীর অরণ্য ছাড়া এদের দেখা পাওয়াই দুষ্কর।

ফোটো : 'ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক'-এর সৌজন্যে

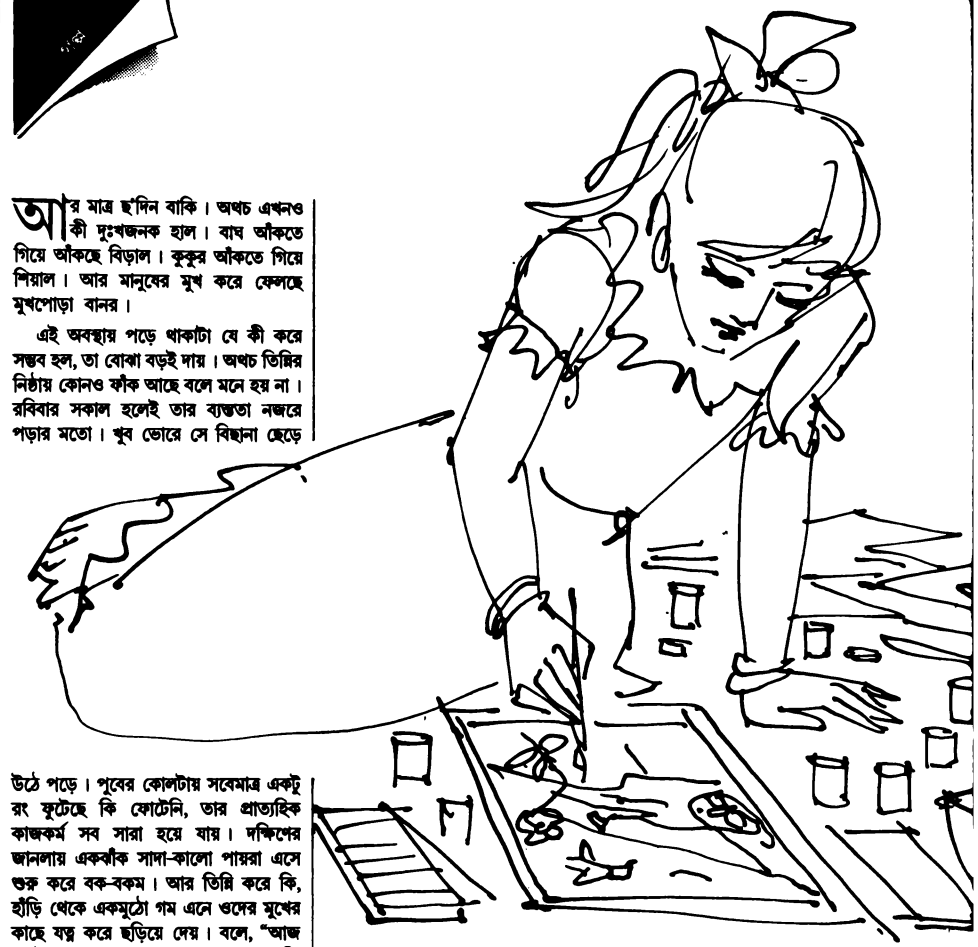

আর মাত্র ছ'দিন বাকি। অথচ এখনও কী দুঃখজনক হাল। বাঘ আঁকতে গিয়ে আঁকছে বিড়াল। কুকুর আঁকতে গিয়ে শিয়াল। আর মানুষের মুখ করে ফেলছে মুখপোড়া বানর।

এই অবস্থায় পড়ে থাকাটা যে কী করে সম্ভব হল, তা বোঝা বড়ই দায়। অথচ তিন্নির নিষ্ঠায় কোনও ফাঁক আছে বলে মনে হয় না। রবিবার সকাল হলেই তার ব্যস্ততা নজরে পড়ার মতো। খুব ভোরে সে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ে। পুবের কোলটায় সবেমাত্র একটু রং ফুটেছে কি ফোটেনি, তার প্রাত্যহিক কাজকর্ম সব সারা হয়ে যায়। দক্ষিণের জানলায় একঝাঁক সাদা-কালো পায়রা এসে শুরু করে বক-বকম। আর তিন্নি করে কি, হাঁড়ি থেকে একমুঠো গম এনে ওদের মুখের কাছে যত্ন করে ছড়িয়ে দেয়। বলে, "আজ একটু বেলা হল। নে, খেয়ে নে। বুঝেছি, বড্ড খিদে পেয়েছে তোদের। আহা, মরে যাই!" পায়রাগুলো কুটুস-কুটুস খায়, আর নিজেদের মধ্যে গণ্ডগোল করে। একবার এ যায় ওর দিকে তাড়া করে, তো পরমুহূর্তেই ও যায় আর-একজনের দিকে তাড়া করে।

তিন্নির বুকটায় ভীষণ কষ্ট লাগে। সে মনে-মনে ভেবে নেয়, ওদের নিশ্চয় পেট ভরেনি। আরও দুটো গম চাইছে ওরা। সঙ্গে-সঙ্গে আরও এক মুঠো গম এনে ছড়িয়ে দিতে-দিতে বলে, "নে, খা। একদম আর ঝগড়া করবি না। তোরা অত বোকা কেন, নিজেদের মধ্যে কেউ আবার ঝগড়া করে নাকি!"

গমের শেষ দানাটি পর্যন্ত খুঁটে খেয়ে নিয়ে পায়রাগুলো উড়ে চলে যায়। একপলক হাওয়া এসে লাগে তিন্নির গায়ে-মুখে। মাথার চুলগুলো এক মুহূর্ত উড়ে আবার বসে পড়ে যথা জায়গায়। মাথায় একবার হাত বুলিয়ে নেয় তিন্নি। তারপর ঘরে ঢোকে। ডাকে, "ও, মা!"

প্রতিমা মুখে কিছু না বলে তিন্নির দিকে তাকান। এবার তার খাওয়ার সময় হয়েছে। তাকে খেতে দিতে হবে। খাওয়ার পর নিজে-নিজেই সে চুল বাঁধবে। তাড়াতাড়ি জামা-প্যান্ট পালটে রং-তুলি-কাগজ নিয়ে আঁকার স্কুলে যাওয়ার জন্য তৈরি হয়ে জুতোটা পায়ে গলাতে গলাতে মাকে বলবে, "মা, আসছি তা হলে।"

কিন্তু আজ রবিবার। রবিবারে তিন্নি যেমন ব্যস্ত থাকে, আজ তার ব্যতিক্রম। ঘরের বাইরে এল তিন্নি। বেলা বেশ বেড়েছে। তিনদিন একটানা বৃষ্টি ঝরার পর আজকের আকাশ ঝকঝকে, পরিষ্কার। রোদের স্পর্শে গাছপালা-নদীনালা-পথঘাটের সঙ্গে তিন্নিও

ছবি ও তিনদল

সমীর ঘোষ

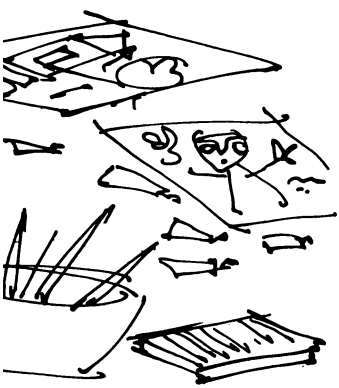

হাসছে। অথচ আঁকার প্রতিযোগিতার আগে আজই তার শেষ স্কুলে যাওয়া। তাও কি স্বাভাবিক নিয়মে ? তা নয় মোটেই।

মফস্বলের সন্ধ্যা। এলোমেলো হাওয়ায় বিস্তর ধুলো ওড়া। গাছের পাতাদের হেলে-দুলে নাচানাচি। শাঁখ বেজে গেছে কিছুক্ষণ আগে। তুলসীতলায় প্রদীপ জ্বলেছে। অরিন্দমের বাড়ির সামনেই লাইট-পোস্ট। সেই পোস্টে ভেপার ল্যাম্প জ্বলে গেছে। ক্লান্ত বিষণ্ণ সুধাংশুভূষণকে অসময়ে আসতে দেখে একটু চঞ্চল হতেই হয় অরিন্দমকে। কেননা এখন তার জরুরি প্রয়োজন। বেশি সময় নষ্ট করলে ঠিক সময়ে এগজিবিশন হলে পৌঁছনো সম্ভব হবে না। সুধাংশুভূষণের প্রয়োজন জানার আগে তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতেই হয়। তাই জানাল অরিন্দম, "আসুন।"

কোনওরকম ভূমিকা না করে সুধাংশুভূষণ সরাসরি বলে বসলেন, "কাল তো রবিবার। তুমি কোনও ক্লাস নেবে না বলেছ। তবে আমার অনুরোধ, তিন্নিকে কাল একটু বিশেষভাবে দেখিয়ে দাও।"

সুধাংশুভূষণের ধারণা, অরিন্দম একটু ভালভাবে দেখালেই তিন্নি ভাল আঁকা শিখে যাবে। বাঘ আঁকতে গিয়ে বাঘই আঁকবে। মানুষকে ঠিক মানুষ করেই ফুটিয়ে তুলবে তেলরং কিংবা জলরঙে।

তা হলে এতদিন কি অরিন্দম ভালভাবে দ্যাখায়নি তিন্নিকে? তিন্নি দিনের পর দিন ভুল এঁকে গেছে, খারাপ এঁকে গেছে, আর অরিন্দম তা দেখেও বিশেষ কোনও ব্যবস্থা নেয়নি ? হ্যাঁ, প্রতিমা অন্তত তাই ভাবেন। তাই যদি না হত তা হলে সুধাংশুভূষণের সঙ্গে কোনও একদিন এই ধরনের কথা হত না। "তিন্নির এত নিষ্ঠা, এত আগ্রহ, অথচ ভাল ছবি করতে পারছে না এখনও। তুমি মধ্যে-মধ্যে অরিন্দমের কাছে যাও। আমার খুব মন বলছে, ওর দিকে অরিন্দম ঠিক নজর দিচ্ছে না।" আটা মাখতে-মাখতে বলেছিলেন প্রতিমা।

সুধাংশুভূষণের মন কিন্তু তা কখনওই বলে না। তাই তিনি বলেন, "তুমি যা ভাবছ তা বোধ হয় নয়। নিষ্ঠা থাকলেও এ-সমস্ত জিনিস তো সবার হয় না। অরিন্দম হয়তো শেখাতে-শেখাতে আলা হয়ে হাল ছেড়ে দিয়েই বসে আছে দ্যাখোগে যাও।"

প্রথম কথা প্রতিমা মা, আর দ্বিতীয়ত বিভিন্ন বইপত্র পড়া রুচিশীলা একজন মহিলা তিনি। তাই এক কথায় ছেড়ে দেওয়ার পাত্রী তিনি নন। বলে ওঠেন, "জন্মসূত্রে প্রতিভা নিয়ে জন্মায় খুব কমজনই। তবে ঘষে-মেজে অনেকেই প্রতিভাধর হয়ে ওঠে, এ-কথা মিথ্যে নয়।" ডাল সাঁতলাতে-সাঁতলাতে প্রতিমা তাঁর বলা কথাকে একটু বাড়িয়ে দিলেন, "ওই মৃদুলার ব্যাপারটাই দ্যাখো না কেন ! বাবা-মা তার দিকে নজর দিতে পারে না। সংসারে অভাব-অনটন তো আছেই। সে-কারণে যখন যা প্রয়োজন তা ঠিকমতো পায় না মৃদুলা। তবু তো এতটা উন্নতি সে করেছে। সেটা কেমন করে সম্ভব হল ? ওই ঘষে-মেজেই তো।"

॥ ২ ॥

"তিন্নি ! এই তিন্নি।" মৃদুলার ডাক। তিন্নি শুনতে পেয়েও প্রথমটায় সাড়া দিল না। "তিন্নি, এই তিন্নি।" আবার ডাকল মৃদুলা। এবার আর শুধু ডাকা নয়। ডাকতে-ডাকতে সে দোতলায় উঠে এল। সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসতেই পড়ে লম্বা দালান। ওই লম্বা দালানের মুখটায় এসে দাঁড়াতেই প্রতিমা, অর্থাৎ তিন্নির মা, মৃদুলার মুখোমুখি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "তুমিও কি আজ স্কুলে যাবে ?"

"হ্যাঁ, মাসিমা ! তিন্নি কোথায় ? ও যাবে না ?"

"যাবে তো। কোথায় গেল মেয়েটা।" প্রতিমা গলা তুলে ডাকলেন, "তিন্নি রে, আয় মা, এদিকে আয়।"

এই মুহূর্তে প্রতিমার মধ্যে কিন্তু ভিন্ন প্রতিক্রিয়া। গতকাল সুধাংশুভূষণ গিয়ে কত করে বলে অরিন্দমকে রাজি করালেন যে, আজ তিন্নিকে একটু বিশেষভাবে দেখাতে হবে। কিন্তু ঘটনাটা কী ঘটল ! মৃদুলা এসে উপস্থিত। তার জন্য নিশ্চয়ই কেউ বলতে যায়নি ? কেননা তার বাবা-মাকে প্রতিমার ভালই চেনা আছে। সুধাংশুভূষণ আবার বলেন কিনা, অরিন্দমের মধ্যে কোনও পক্ষপাতিত্ব নেই। এক্ষেত্রে তা হলে কী হল ? মৃদুলার ওপর পক্ষপাতিত্ব করা হল না কি ?

হাসিমুখে এগিয়ে এল তিন্নি। তার জামা-প্যান্ট পরা হয়ে গেছে। মোজাটা পরতে-পরতে সে মৃদুলাকে উদ্দেশ্য করে বলল, "আজ আর ভাল লাগছে না যেতে। শুধু বাবার জন্যই যাওয়া।"

মৃদুলা বলল, "কাল রাত্তিরে অরিন্দমকাকু আমাদের বাড়িতে গিয়ে বলে এলেন, আজ স্কুলে যাওয়ার কথা। আমার খুব ভাল লাগছে।"

প্রতিমার মুখ থেকে এই সমস্ত কথা শোনার পর সুধাংশুভূষণ বললেন, "ঠিক আছে।"

কিন্তু এত সংক্ষিপ্ত কথায় সন্তুষ্ট হলেন না প্রতিমা। অল্প একটু রেগে গিয়ে ঝাঁঝিয়ে উঠলেন, "ঠিক আছে, তার মানে ?"

সুধাংশুভূষণ পড়েছেন এক মহা ঝামেলায়। তিনি পরিষ্কার বুঝতে পারছেন, তিন্নির পক্ষে এর চাইতে ভাল আঁকা সম্ভব নয়, অন্তত এখন। কিন্তু প্রতিমার মুখের ওপর এই চরম সত্য কথাটা বলা মোটেই সহজ নয়। সহজ নয় তো বটেই, বলা যাবেই না। তাই একটু পাশ কাটিয়ে গিয়ে তিনি 'ঠিক আছে'-এর মানে এইভাবে করলেন, "তিন্নি যেমন আঁকছে এখন আঁকুক। তবে

আমাদের লক্ষ রাখতে হবে, তার নিষ্ঠা ও আগ্রহটা যেন বজায় থাকে। তারপর পরীক্ষা দিক না, কেমন ফল করে দেখা যাক। খারাপ হলে তখন অন্য ব্যবস্থা করা যাবে।"

নীল আকাশে সাদা মেঘের ওড়না উড়ছে পত্‌পত করে। অশান্ত পাখিদের ডাক শোনা যাচ্ছে, অনবরত কিচির-মিচির, ত্তিত্তিউক ··· ত্তিত্তিউক ···। বিচিত্র ডাক। বৈচিত্র্যভরা পরিবেশে তিন্নি আর মৃদুলা রওনা দিল। হাত ধরে হেঁটে চলেছে নিষ্পাপ দুটি প্রাণ। লজ্জা নেই। ক্ষোভ নেই। ছোট-বড় বোধ নেই। ওদের জ্ঞানে সব সমান। সমান-সমান।

॥ ৩ ॥

জেলাস্তর অঙ্কন প্রতিযোগিতায় তিন্নি কোনও স্থানই পেল না। অবশ্য মৃদুলাও পায়নি। এক্ষেত্রে তিন্নি যে অসফল হল, সে যে ভাল ছবি আঁকতে পারল না, তা নিয়ে কোনও আলোচনা হল না। মাঝখান থেকে গুণিজনদের ভেতর কথা উঠল, মৃদুলা সুন্দর ছবি আঁকা সত্ত্বেও তাকে পুরস্কার দেওয়া হল না পক্ষপাতিত্ব করে। এমনকী অঙ্কন শিক্ষকের হিসেবেও এটা মিলে গেল। তাই শুনে প্রতিমা জ্বলে উঠলেন তেলে-বেগুনে। সুপর্ণার মুখোমুখি একদিন বলেই ফেললেন, "সে-কথা তো আমিও বলতে পারি। তিন্নির ক্ষেত্রেও পক্ষপাতিত্ব করা হয়েছে। নিজের-নিজের দিকে ঝোল টানতে সবাই ওস্তাদ। ওসব আমার ভালই জানা আছে।"

অথচ সুপর্ণার মধ্যে বিন্দুমাত্র রাগ নেই। তিনি হাসিমুখে বললেন, "এ-কথা তো আমি বা আপনার দাদা বলছি না, এটা ওখানে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, তাঁরাই ছবি দেখে বলছেন। বিচারকেরা অনেক সময়েই তো ভুল করেন। করেন বইকী। মানুষমাত্রই ভুল হতে পারে।"

প্রতিমা অবশ্য বললেন, "না, তা হতে পারে না। বিচারক মানেই বড়-বড় সব বোদ্ধা মানুষ। জ্ঞানী মানুষ। তাঁদের ভুল হতেই পারে না।"

সুধাংশুভূষণ রাত্তিরে খাওয়ার পর্ব চুকিয়ে ফেলার পর প্রতিমাকে জিজ্ঞেস করলেন, "তিন্নির ছবির দশা দেখলে?"

বেশ ক্ষুব্ধ প্রতিমা। "দেখলাম বইকী।"

"কেমন লাগল?"

"ভালই তো।"

"মৃদুলার ছবিটা দেখেছ?"

"না, ওর ছবি আমি দেখতে যাব কেন?"

"তা হলে আর তিন্নিরটা ভাল হয়েছে বলছ কী করে?"

অন্যদিন সুধাংশুভূষণ ঘরে এসে চেয়ারে

বসেন। ডায়েরি লেখেন। ডায়েরি লেখা শেষ করে জীবনানন্দ পড়েন। জীবনানন্দের কবিতা পড়ে তিনি মাটির অদ্ভুত গন্ধ পান। সেই গন্ধে তাঁর মন-প্রাণ নেচে ওঠে। পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা জীবনানন্দ পড়তে কোনও ক্লান্তি আসে না।

আজ তিনি ঘরে এলেন না। সুধাংশুভূষণের এখন জল চাই। জল এল। একটু বাতাসের দরকার। বাতাস চলল। চেয়ারে বসে ভাল লাগছে না, একটা শতরঞ্চি চাই। শতরঞ্চি এল। বারান্দায় ভাল লাগছে না, ছাদে যাওয়া চাই। ছাদে এলেন। অন্ধকার নয়, একটু আলো চাই। আলো এল। বসে-বসে আজ জীবনানন্দ পড়া নয়, শুয়ে-শুয়ে আজ জীবনানন্দ শোনা চাই। শুরু হল জীবনানন্দ পাঠ। পাঠ করতে শুরু করলেন প্রতিমা।

এতক্ষণ সবকিছু সুধাংশুভূষণের মনের মতো হল। কিন্তু সবশেষে তিনি যা বললেন তা প্রতিমার সম্পূর্ণ অমনোমতো। কথাটি হল, "মৃদুলা আন্তর্জাতিক অঙ্কন প্রতিযোগিতায় রাষ্ট্রপতি পুরস্কার পাচ্ছে।"

রুদ্ধ নিশ্বাসে কথাগুলো শোনার পর প্রতিমা রীতিমত ফুঁসে উঠলেন, "অসম্ভব।"

"অলকেশবাবুর কাছ থেকেই তো শুনলাম। মাসকয়েক আগে মৃদুলার ছ'খানা ছবি উনি দিল্লিতে পাঠিয়েছিলেন। হবে কি হবে না, তাই উনি কাউকে কিছু বলেননি। মৃদুলা সত্যিই ভাল ছবি করছে গো। রাষ্ট্রপতি পুরস্কার পাওয়ার পর এখন আর তো কোনও সংশয় বা দ্বিধা থাকতে পারে না।"

"কখন শুনলে তুমি এসব কথা?"

"এই তো, বাড়ি ফেরার সময়।"

"কই, বিকেলে সুপর্ণা এসেছিলেন, তিনি তো কিছু বললেন না তবে আমায়?"

"হয়তো উনি তখন জানতেন না।"

"হতেই পারে না।"

"অত অবিশ্বাস করার কিছু নেই। আমাকে দিল্লির চিঠিটা পর্যন্ত মৃদুলার বাবা অলকেশবাবু দেখিয়েছেন।" তারাভর্তি

আকাশের দিকে তাকিয়ে সুধাংশুভূষণ মনে হয় মঙ্গল গ্রহটাকে খুঁজতে লাগলেন।

পরের দিন সকালবেলা অকাতরে ঘুমিয়ে ছিল তিন্নি। বেলা বেড়েছে। রোদ ফুটে গেছে খটখটে। প্রতিমা বিরক্ত হয়ে চেঁচামেচি শুরু করে দিলেন। তাই শুনে তিন্নি হঠাৎ ধড়মড় খেয়ে চমকে মুহূর্তের জন্য শক্ত হয়ে গেল। কিছুক্ষণ তার মুখ দিয়ে কোনও কথা সরল না। বোবা-দৃষ্টিতে মায়ের মুখের দিকে সে তাকিয়ে থাকল।

প্রতিমার রাগ অবশ্য তাতেও কমল না। পিঠের ওপর দুম-দুম শব্দে বসিয়ে দিলেন বেশ কয়েকটা চাপড়। তাতে হাউহাউ করে কেঁদে উঠল তিন্নি।

পাশের ঘর থেকে দৌড়ে এলেন সুধাংশুভূষণ। তিন্নিকে সস্নেহে কোলে তুলে নিয়ে বললেন, "ঘুমন্ত মেয়েটাকে এমন করে মারছ কেন? ছিঃ ছিঃ! পিঠটায় একেবারে পাঁচটা আঙুলের দাগ ফেলে দিয়েছ দেখছি!"

"শুধু দাগই তো পড়েছে, ওকে আমি মেরেই ফেলব।" প্রতিমার রাগ সপ্তমেই চড়ে থাকে।

এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তিন্নি খুব অবাক হল। আর হবেই তো। মায়ের মুখ থেকে এমন ধরনের সব কথা এর আগে কোনওদিন তো সে শোনেনি, তাই মায়ের বলা কোনও কথারই সঠিক অর্থ বুঝতে পারল না তিন্নি।

তিন্নির মা মাথায় তেল দিয়ে স্নান করলেন। নিজে হাতে ফুল তুলে এনে ঠাকুর-পুজো করলেন। তিন্নি শুম হয়ে বসে ছিল, মুখের সামনে সন্দেশ দিয়ে মুড়ির বাটিটা ধরে দিয়ে গেলেন। খুব একচোট কান্না এসে গেল তিন্নির চোখে। টনটন করে উঠল চোখদোড়া। এর পর প্রতিমা আঁচ দিলেন। কুটনো কুটলেন। ভাতের জল হাঁড়ি করে চড়ালেন। দুধ এনে দুধ জ্বাল দিলেন।

সমস্ত কিছু লক্ষ করল তিন্নি। কিন্তু তার বাবা সেই যে সাত-সকালে ঘরের মধ্যে ঢুকেছেন, এখনও তাঁর বেরনোর নামটি অবধি নেই। অন্যদিন এতক্ষণে অফিস যাওয়ার জন্য তৈরি হন। মা খেতে দেন।

এই সময়টা তিন্নির দুধ খাওয়ার সময়। প্রতিমা দুধ জ্বাল দিয়েই তাকে ডাকেন। আজ তিন্নি লক্ষ করল, মা ডাকলেন না। তার মনটা কেমন যেন হু-হু করে জ্বলে উঠল। সেই কোন সকাল থেকে কেউ তার সঙ্গে একটি কথা পর্যন্ত বলেননি। এ যে কী দুঃখের! এটা যে কতবড় অপমান!

রান্নাঘরের চৌকাঠের কাছে দাঁড়িয়ে খুব ভয়ে-ভয়ে তিন্নি এক সময় বলে উঠল, "মা, দুধ দাও।"

মা ঠিক মায়ের মতোই রান্না করতে লাগলেন। তিন্নির কথায় তিনি কোনওরকম কর্ণপাত করলেন না। হঠাৎ তিন্নি দেখে ফেলল, মায়ের চোখে জল। মা তা হলে কাঁদছেন? কত আদরের মেয়ে তিন্নি। তাও আবার একমাত্র। সেই তাকে এত বকা! এত কটু কথা বলা! তা মায়ের অন্তরে ব্যথা লাগবে বইকী! এই ভেবে তিন্নি ভীষণভাবে একবার কেঁপে ওঠে। ইস-স, মায়ের কষ্টের যেন আর শেষ নেই। পিঠে হাত বুলিয়ে জড়িয়ে ধরে তিন্নির বলতে ইচ্ছে হল, "মা, তুমি কেঁদো না। তুমি কাঁদলে, তোমার কান্না দেখে আমার যে ভীষণ কষ্ট হয়!" কিন্তু এ-কথা সে বলতে পারল না। কেননা সে ভালই জানে, মা যখন রেগে থাকেন তখন ভাল কথা বলতে গেলেও পিটুনি খেতে হয়।

॥ ৪ ॥

ওইদিনই বিকেলবেলা তিনটি দল গঠন হল। এবং তিনটি দল তিনটি সিদ্ধান্তে এল।

প্রথম দলটিতে যাঁরা রইলেন তাঁরা হলেন অলকেশ ও সুপর্ণা অর্থাৎ মৃদুলার বাবা-মা। প্রথম দলের সিদ্ধান্ত এইরকম: তিন্নির বাবা-মা উভয়েই কারও ভাল ও উন্নতি দেখতে বা সহ্য করতে পারেন না। সুতরাং মৃদুলা সুন্দর ছবি আঁকছে, সে পুরস্কার পাচ্ছে, তাকে যে বহু মানুষ প্রশংসা করছে, এই সমস্ত কথা যা ইতিমধ্যে বলা হয়েছে—হয়েছে। এর পর থেকে আর কিছু ওঁদের বলা হবে না। যাতায়াতও কমিয়ে দেওয়া হবে। তবে সম্প্রীতি অবশ্যই অক্ষুণ্ণ থাকবে।

দ্বিতীয় দলটিতে যাঁরা রইলেন তাঁরা হলেন সুধাংশুভূষণ ও প্রতিমা। অর্থাৎ তিন্নির বাবা-মা। দ্বিতীয় দলের সিদ্ধান্ত এইরকম: তিন্নির যথেষ্ট যোগ্যতা আছে। পক্ষপাতিত্ব করে ওকে পিছিয়ে রাখা হচ্ছে। ও যদি ঠিকমতো সুযোগ পেত, তা হলে মৃদুলার চেয়ে অনেক ভাল ছবি আঁকতে পারত। সেই কারণে অঙ্কন-শিক্ষক হিসেবে অরিন্দমকে আর রাখা হবে না। ওর চেয়ে স্বর্ণেন্দু অনেক-অনেক ভাল, ওর কাছে তিন্নিকে ভর্তি করিয়েদেবেন আগামী মাস থেকে। মৃদুলার সঙ্গে তিন্নির যে ওঠাবসা তা বন্ধ করতে হবে যে-কোনওভাবে। কেননা তিন্নি ভারী বোকা। তার মাথায় চাঁটি মেরে মৃদুলা যে বেরিয়ে যাচ্ছে, সেটা বোঝার ক্ষমতা তার নেই। এটা তাকে ভাল করে বুঝিয়ে দিতে হবে।

তিন নম্বর দলটিতে রইল, তিন্নি আর মৃদুলা। তারা যা সিদ্ধান্ত নিল তা এইরকম: তিন্নি অনেক চেষ্টা করেও ভাল ছবি আঁকতে পারছে না। এখনও বাঘ আঁকতে গিয়ে বিড়াল, আর কুকুর আঁকতে গিয়ে শিয়াল এঁকে বসছে। এবং মানুষের মুখগুলো করে ফেলছে মুখপোড়া বানর। তাই অরিন্দমকাকুর কাছে তারা যেমন আঁকা শিখছে—শিখবে। এর পর যেহেতু মৃদুলা অনেক ভাল ছবি আঁকতে শিখে গেছে, সকলেই যখন তার ছবি দেখে মুগ্ধ হতে পারছে, তখন তিন্নি আর নুন-গাদি, কিংবা চোর-পুলিশ খেলে সময় নষ্ট করবে না। ওই সময় সে মৃদুলার কাছে এসে ভাল করে মন দিয়ে ছবি আঁকা শিখবে। একদিন সে ঠিক ভাল ছবি আঁকতে পারবে। তাকে আঁকতেই হবে।

ছবি : কৃষ্ণেন্দু চাকী

কেরিয়ার গাইড

অডিট ও অ্যাকাউন্টস অফিসার হতে হলে

সরকারি পদে লোক নিয়োগের জন্য পশ্চিমবঙ্গ পাবলিক সার্ভিস কমিশন যেসব পরীক্ষা পরিচালনা করেন তাদের মধ্যে অডিট ও অ্যাকাউন্টস সার্ভিস পরীক্ষা অন্যতম। সরকারি প্রতিষ্ঠানে বাজেট অনুযায়ী খরচপত্রের টাকা ধার্য করা থাকে। সেসব ঠিকভাবে খরচ করা হচ্ছে কি না কিংবা খরচপত্রের হিসেব যথাযথ আছে কি না এ-বিষয়ে প্রাথমিক দায়িত্ব অডিট এবং অ্যাকাউন্টস অফিসারের। তিনি হিসেবপত্র পরীক্ষা করে খরচের অনুমতি দেন, এবং সরকারি খাতে খরচপত্রও করেন। এই কাজকর্মের ধরন থেকে সহজেই অনুমান করা যায় এ-পদের গুরুত্ব কতখানি।

পরীক্ষা কী ও কেন

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অডিট ও অ্যাকাউন্টস সার্ভিস এবং জুনিয়ার অডিট ও অ্যাকাউন্টস সার্ভিসের অধীনে দায়িত্বশীল পদে সরাসরি নিয়োগের জন্য এই পরীক্ষা নেওয়া হয়। এটি যৌথ প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা। সাধারণত কলকাতায় এই পরীক্ষা নেওয়া হয়। প্রার্থী-সংখ্যা বেশি হলে অবশ্য দার্জিলিং শহরেও পরীক্ষা-কেন্দ্র খোলা হয়। তবে পার্বত্য অঞ্চলের, বিশেষ করে দার্জিলিং সদর, কার্শিয়াং,কালিম্পং মহকুমার উপজাতি প্রার্থীরাই দার্জিলিং কেন্দ্রে পরীক্ষা দিতে পারে। বছরের কোন সময়ে এই পরীক্ষা নেওয়া হবে তার কোনও ধরাবাঁধা নিয়ম নেই। তবে সাধারণত ডিসেম্বর মাস নাগাদ এই পরীক্ষা হয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকার পাবলিক সার্ভিস কমিশনকে শূন্যপদের সংখ্যা জানিয়ে দেন এবং সেই সংখ্যা অনুযায়ী সফল প্রার্থীদের প্যানেল তৈরি করা হয়। একজন প্রার্থী দুটি ক্যাটিগরি অর্থাৎ অডিট ও অ্যাকাউন্টস সার্ভিস এবং জুনিয়ার অডিট ও অ্যাকাউন্টস সার্ভিস পদের জন্যই পরীক্ষায় বসতে পারে, আবার যে-কোনও একটি সার্ভিস পদের জন্যও বসতে পারে। প্রার্থীর পছন্দ আবেদনপত্রে পরিষ্কারভাবে (১৫ নং কলামে) উল্লেখ করতে হয়।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিভিন্ন সরকারি পদে নিয়োগের জন্য পাবলিক সার্ভিস কমিশন বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে প্রার্থী বাছাই করে মনোনয়ন পর্ব শেষ করে থাকেন। এইসব প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মধ্যে আছে ডব্লিউ·বি·সি·এস একজিকিউটিভ এবং জুডিশিয়াল পরীক্ষা, ফরেস্ট সার্ভিস পরীক্ষা, মিসলেনিয়াস সার্ভিসেস পরীক্ষা, ক্লার্কশিপ পরীক্ষা ইত্যাদি। ওয়েস্ট বেঙ্গল অডিট অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস সার্ভিস এগজামিনেশন তাদের মধ্যে অন্যতম। এই পরীক্ষার বৈশিষ্ট্য হল :

(১) এটি যৌথ প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা।

(২) এই পরীক্ষার মাধ্যমে ওয়েস্ট বেঙ্গল অডিট অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস সার্ভিস এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়ার অডিট অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস সার্ভিসের বিভিন্ন পদে প্রার্থী মনোনয়ন করা হয়।

(৩) যে-কোনও কমার্সের স্নাতক এই পরীক্ষায় বসতে পারেন।

(৪) প্রার্থীকে লিখিত এবং মৌখিক পরীক্ষায় বসতে হয়।

পরীক্ষার নিয়মকানুন

পরীক্ষা দুটি ভাগে বিভক্ত—আবশ্যিক এবং ঐচ্ছিক। লিখিত পরীক্ষার পর সফল প্রার্থীদের পার্সোন্যালিটি টেস্ট দিতে হয়। আবশ্যিক বিষয়ের মধ্যে চারটি পেপারে পরীক্ষায় বসতে হয়। প্রতিটি পেপারে একশো নম্বরের মধ্যে পরীক্ষা হয়; সময় নির্দিষ্ট থাকে তিন ঘণ্টা হিসেবে। আবশ্যিক (কম্পালসরি) পেপারগুলো হল : (ক) ইংরেজি রচনা, সার সংক্ষেপ এবং অনুবাদ (খ) বাংলা (হিন্দি, উর্দু অথবা নেপালি) রচনা, সার সংক্ষেপ এবং অনুবাদ ; (গ) সাধারণ জ্ঞান এবং বর্তমান ঘটনা ; (ঘ) বাণিজ্যিক অঙ্ক। আবশ্যিক পেপারগুলোতে পরীক্ষায় বসার সঙ্গে-সঙ্গে ঐচ্ছিক পেপারেরও পরীক্ষায় বসতে হয়। যেসব প্রার্থী ওয়েস্ট বেঙ্গল অডিট অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস সার্ভিস পদের জন্য পরীক্ষায় বসবে তাদের তিনটি ঐচ্ছিক পেপারে পরীক্ষা দিতে হয়। প্রতিটি পেপার একশো নম্বরের এবং সময় তিন ঘণ্টা। আর যেসব প্রার্থী ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়ার অডিট অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস সার্ভিস পদের জন্য পরীক্ষায় বসবে তাদের দুটি ঐচ্ছিক পেপারে মোট দু'শো নম্বরের পরীক্ষায় বসতে হয়। এবার ঐচ্ছিক পেপারের একটা তালিকা জানানো দরকার।

এই তালিকা থেকেই প্রার্থী তার পছন্দমতো পেপার বেছে নিতে পারে। ঐচ্ছিক পেপারগুলো হল : স্ট্যাটিসটিকস, ব্যাঙ্কিং ইকনমিকস, অ্যাডভান্সড অ্যাকাউন্ট্যান্সি , অ্যাডভান্সড কমার্শিয়াল জিওগ্রাফি, বিজনেস অর্গানাইজেশন অ্যান্ড মেথডস, কমার্শিয়াল অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল ল, অডিটিং, কস্টিং ট্যাক্সেশন ল'জ অ্যান্ড প্র্যাকটিস।

এখানে একটা কথা মনে রাখা দরকার, কোনও প্রার্থী যদি দুটি ক্যাটিগরির সার্ভিস পদের জন্যই পরীক্ষায় বসতে চায় তা হলে তাকে এই তালিকা থেকে তিনটি পেপারেই পরীক্ষায় বসতে হবে। সেক্ষেত্রে প্রথম ক্যাটিগরি সার্ভিস পদে বিবেচনার জন্য প্রার্থী তিনটি পেপারে যত নম্বর পাবে তত নম্বর যোগ করা হবে। সেই প্রার্থী যদি জুনিয়ার অডিট অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস সার্ভিস পদের জন্যও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে থাকে তা হলে যে দুটি ঐচ্ছিক পেপারে প্রার্থী সর্বোচ্চ নম্বর পাবে সেই দুটি পেপারের নম্বর যোগ করে এগ্রিগেট নম্বরের হিসেব করা হবে।

এবারে বিভিন্ন পেপারের প্রশ্নের মান নিয়ে একটু আলোচনা করা যাক। কমার্শিয়াল ম্যাথমেটিকস, অর্থাৎ বাণিজ্যিক অঙ্ক বিষয়ে বি কম পাশ কোর্সের মতো প্রশ্নের মান বজায় রেখেই প্রশ্নপত্র রচনা করা হয়। প্রশ্নের মান কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি কম পাশ কোর্সের মতোই। তবে ঐচ্ছিক বিষয়ের প্রশ্নের মান আরও একটু উন্নত ধরনের অর্থাৎ ভারতীয় যে-কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্স ডিগ্রি অর্থাৎ সাম্মানিক শ্রেণীর মানের মতো। বিভিন্ন পেপারের প্রশ্নের উত্তর ইংরেজি অথবা বাংলা ভাষায় লেখা যায়। কোনও-কোনও ঐচ্ছিক পত্রের উত্তর নেপালি ভাষায়ও লেখা যেতে পারে। ভাষা পত্রের পরীক্ষায় সেই ভাষাতেই উত্তর লিখতে হয়, যেমন হিন্দি বা নেপালি ভাষার পত্রে দেবনাগরি হরফে উত্তর লিখতে হয় কিন্তু বাংলা বা উর্দুপত্রে বাংলা বা উর্দু হরফেই উত্তর লেখা যাবে।

সিলেবাস

আগেই আমরা জেনেছি, কমার্সের ছাত্রছাত্রীরাই এই পরীক্ষায় বসতে পারে। সেজন্য অপশনাল পেপার, অর্থাৎ ঐচ্ছিকপত্রের তালিকা তাদের বিষয়ের মতো রাখা হয়েছে। কেননা কমার্সের স্নাতককে এইসব বিষয় পড়তে এবং জানতে হয়। বিষয় : স্ট্যাটিসটিকস। এতে থাকছে কমপাইলেশন, ক্লাসিফিকেশন, ট্যাবুলেশন অব ডাটা। ফ্রিকোয়েন্সি ডিস্ট্রিবিউশন, গ্রাফস, চার্ট, বার ডায়াগ্রাম, পাই ডায়াগ্রাম, হিস্টোগ্রাম, পিক্টোগ্রাম, সেন্ট্রাল টেনডেন্সি, কমপাইলেশন, অব অ্যারিথমেটিক মিন, মিডিয়ান, মোড, কমপারিজন অব মিন, মিডিয়ান, মোড, মেজারস অব ডিসপারসন, মিন ডিভিয়েশন, স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন, স্কিউনেস, কার্টোসিস। সিনিয়ার রিগ্রেশন অ্যান্ড কো-রিলেশন, রিগ্রেশন, কো-এফিসিয়েন্ট অব কো-রিলেশন। টাইম সিরিজ, ইনডেক্স নম্বর প্রভৃতি।

বিষয় : ইকনমিকস। এতে থাকছে—সাবজেক্ট ম্যাটার অ্যান্ড স্কোপ, থিওরি অব কনজিউমার ডিমান্ড, থিওরি অব ফার্ম আন্ডার ডিফারেন্ট মার্কেট ফর্মস, ফ্যাক্টর প্রাইসিং—ওয়েজেস, ইন্টারেস্ট, রেন্ট অ্যান্ড প্রফিটস, মানিটারি সিস্টেম—কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কিং অ্যান্ড সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কিং, মানিটারি থিওরি—ইনকাম, এমপ্লয়মেন্ট, আউটপুট—ভ্যালু অব মানি, ইনফ্লেশন অ্যান্ড ডিফ্লেশন। মানিটারি পলিসি-ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড অ্যান্ড ফরেন এক্সচেঞ্জ, ব্যালান্স অব পেমেন্টস, এক্সচেঞ্জ রেট ডিটারমিনেশন, এক্সচেঞ্জ কন্ট্রোল, গভর্নমেন্ট ফিনান্স—পাবলিক এক্সপেন্ডিচার, ফিসকাল পলিসি, ইকনমিক প্ল্যানিং। ব্যাঙ্কিং বিষয়ে চারটি ভাগ—ব্যাঙ্কিং থিওরি, ব্যাঙ্কিং প্র্যাকটিস, ব্যাঙ্কিং ল, কারেন্সি অ্যান্ড ফরেন এক্সচেঞ্জ। অন্যান্য বিষয়ে মোটামুটিভাবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাস অনুসরণ করেই প্রশ্নপত্র রচনা করা হয়। তবে মনে রাখা দরকার প্রশ্নের মান এবং উত্তরের মান দুটিই কিন্তু অনার্স স্ট্যান্ডার্ডের হওয়া চাই।

পরীক্ষার ফি সাধারণ প্রার্থীদের জন্য ৫৫ টাকা। তফসিলি জাতি ও উপজাতি প্রার্থীদের জন্য ১৪ টাকা।

আবেদনের পদ্ধতি

পরীক্ষা-সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রচার করা হয়। তা ছাড়া কমিশনের অফিসের নোটিস বোর্ডেও বিজ্ঞাপনের তথ্য এবং পরীক্ষা-সংক্রান্ত নানা প্রয়োজনীয় তথ্য টাঙিয়ে দেওয়া হয়।

সংবাদপত্রে প্রচারিত বিজ্ঞাপনের বয়ান অনুযায়ী ফর্ম সংগ্রহ করে আবেদন করতে হয়। হাতে-হাতে ফর্ম সংগ্রহ করা যায় ১৬১এ, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড, কলকাতা-৭০০০২৬ ঠিকানার পাবলিক সার্ভিস কমিশনের অফিস থেকে। সাধারণত বিজ্ঞাপিত তারিখের মধ্যে যে-কোনও কাজের দিনে ফর্ম দেওয়া হয়। নাম-ঠিকানা লেখা ডাকটিকিটযুক্ত বড় খাম পাঠালে ডাকযোগে ফর্ম পাঠানোর ব্যবস্থা আছে।

নিজের হাতে লিখে ফর্ম পূরণ করতে হয়। সঙ্গে দিতে হয় প্রার্থীর দু' কপি ফোটোগ্রাফ। ফর্মের সঙ্গে সার্টিফিকেটের (বয়স কিংবা শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রমাণপত্র) প্রত্যয়িত নকল পাঠানো দরকার নেই। কমিশন প্রয়োজনে প্রার্থীর কাছ থেকে এসব চেয়ে নিতে পারেন। পূরণ-করা ফর্ম সরাসরি কমিশন অফিসে জমা দেওয়া যেতে পারে। পরীক্ষা-সংক্রান্ত বিভিন্ন খবরাখবর ডেপুটি সেক্রেটারি (এগজামিনেশনস)-এর কাছ থেকে জানা যেতে পারে।

যোগ্যতা

এই পরীক্ষায় বসতে হলে প্রার্থীকে সর্বাগ্রে ভারতের নাগরিক হতে হবে। শিক্ষাগত যোগ্যতা হিসেবে প্রার্থীকে কোনও অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয়ের কমার্স গ্র্যাজুয়েট হতে হবে। তবে চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট কিংবা কস্ট-অ্যাকাউন্ট্যান্টও পরীক্ষায় বসতে পারবেন। আবেদনের বছরে ১ জানুয়ারি তারিখে প্রার্থীর বয়স যেন ৩০ বছরের বেশি না হয়। সর্বোপরি প্রার্থীকে চরিত্রবান এবং সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হতে হবে।

তফসিলি জাতি বা উপজাতির প্রার্থী ভিন্ন অন্য প্রার্থীরা তিনবারের বেশি পরীক্ষায় বসতে পারবেন না। তফসিলি জাতি-উপজাতি প্রার্থীরা আইনানুগভাবে উর্ধ্বতম বয়ঃসীমার ক্ষেত্রে পাঁচ বছর ছাড় পেতে পারেন। দৈহিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের বয়ঃসীমা পঁয়তাল্লিশ বছর পর্যন্ত রাখা হয়েছে। তবে তাঁরা পরীক্ষার ক্ষেত্রে সাহায্যকারী পাবেন না।

ছবি : দেবাশিস দেব

খেলাধুলো

কঠিন পরীক্ষায় হেনস

ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের ওপেনার ডেসমন্ড হেনস এই প্রথম দুটি পুরো সফরের অধিনায়কত্ব করছেন। তাঁর এবং দলের সাফল্যের সম্ভাবনা নিয়ে লিখেছেন তমাল রায়

গত ভারত সফরে এসে এক সাক্ষাৎকারে বলে গিয়েছিলেন ডেসমন্ড হেনস, অধিনায়কত্ব করার খুব ইচ্ছে তাঁর নেই। তিনি সহ-খেলোয়াড়দের সঙ্গে বন্ধুর মতো মেশেন; তাঁদের নির্দেশ দিতে পারবেন না। অথচ কিছুদিন আগে ভিভ রিচার্ডস অসুস্থ হওয়ায় অধিনায়কত্বের কঠিন দায়িত্ব বর্তেছে হেনসের ওপর। শুধু প্রবীণ এবং অভিজ্ঞ বলেই নয়, দলের ক্রিকেটারদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ভাল বলেই নাকি তাঁকে এই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তাই শুধু ক্রিকেটার হিসেবেই নয়, অধিনায়কত্বের কঠিন দায়িত্বেও সসম্মানে উত্তীর্ণ হওয়ার পরীক্ষা শুরু হয়ে গিয়েছে বার্বাডোজের ৩৪ বছরের এই সফল ওপেনারটির।

হেনসই শুধু নন, বার্বাডোজে জন্মেছেন অনেক সুবিখ্যাত ক্রিকেটার। সার গারফিল্ড সোবার্স তো আছেনই, ওয়েস হলও ওখানে জন্মেছেন। সোবার্স হলেন হেনসের আদর্শ ক্রিকেটার। হেনসকে একটি চমৎকার শিক্ষা দিয়েছিলেন সোবার্স। তখন জাতীয় জুনিয়ার দলের হয়ে খেলছেন হেনস, তবে সাফল্য সেরকম পাচ্ছেন না। একদিন সোবার্স মাঠ থেকে বেরোনোর সময় তাঁর ব্যাটটি চেয়ে বসলেন হেনস। সোবার্স ব্যাটটি তাঁকে না দিয়ে অন্য একজনকে দিলেন। বললেন, "আগে যোগ্য হও, জাতীয় দলে খেলো, তারপর আমার কাছ থেকে উপহার পাবে।" তাৎক্ষণিক দুঃখ পেয়েছিলেন হেনস। পরে বুঝেছিলেন তাঁকে উসকে দেওয়ার জন্যই সোবার্স ওইরকমভাবে বললেন। তবে সোবার্সের কথা রেখেছিলেন হেনস, যোগ্য হয়ে জাতীয় দলে খেলে। সোবার্সও তাঁকে উপহার দিয়ে কথা রেখেছিলেন। বর্তমানে হেনস শুধু ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের নির্ভরযোগ্য ক্রিকেটার নন, বিশ্বের অন্যতম সেরা ওপেনার। হেনস-গ্রিনিজ তো বিশ্বসেরা ওপেনিং জুটি। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ১৯৭৮-এ প্রথম টেস্ট খেলেন হেনস। এই মরসুমে একেবারে অধিনায়ক।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের অধিনায়ক হওয়ার সুবিধে যেমন আছে, তেমনই আছে

হেনসের (ডান দিকে) মস্ত ভরসা মার্শাল (বাঁ দিকে)

অসুবিধে। সুবিধে, একটি সুসংহত দলকে পাওয়া যায়। এবারে অধিকাংশ ক্রিকেটারই ফর্মে আছেন। হেনস ছাড়া গ্রিনিজ, রিচি রিচার্ডসন ব্যাটে এবং বলে ম্যালকম মার্শাল, অ্যামব্রোস, ওয়ালশরা বিপক্ষকে সমস্যায় ফেলার ক্ষমতা রাখেন। অধিকাংশ সময়ে ফেলেও থাকেন। হেনসের অসুবিধে, ভিভ রিচার্ডসের মতো প্রতিভাবান এবং চৌকশ ক্রিকেটার এবারে নেই, খেলার রং পরিবর্তন করে দেওয়ার দক্ষতা আছে ভিভের।

এ ছাড়া পাকিস্তানে একদিকে আছেন ইমরানের মতো অলরাউন্ডার, অন্যদিকে আক্রম ও ওয়াকার ইউনুসের মতো ফর্মে থাকা বিধ্বংসী দুই বোলার। যেভাবে নিউজিল্যান্ডকে হারিয়েছে পাকিস্তান, তখনই বোঝা গিয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে সহজে তারা ছাড়বে না। এ ছাড়া ইমরানের একটি সুপ্ত আকাঙ্ক্ষাও আছে, খেলা ছাড়ার আগে দেশের মাটিতে ক্যারিবিয়ানদের হারানো। ভারতেও একদিনের ম্যাচগুলিতে অধিনায়ক হেনসকে মোকাবিলা করতে হবে শক্তিশালী ব্যাটসম্যানদের। শচীন তেণ্ডুলকর, সঞ্জয় মঞ্জরেকর, আজহারউদ্দিন, কপিলদেব সহজে মার্শালদের ছেড়ে দেবেন না।

সুতরাং এবারে হেনসের অন্যরকম পরীক্ষা। ওয়েস্ট ইন্ডিজের ক্রিকেট কর্মকর্তারা ভিভের পরিবর্তে যোগ্য হাতে দায়িত্ব দিয়েছেন কি না তা কিছুদিনের মধ্যেই প্রমাণ হয়ে যাবে।

একনজরে ডেসমন্ড হেনস

জন্ম : ১৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৬
টেস্ট শুরু : ১৯৭৮
টেস্টে রান : ৫৭১১
মোট টেস্ট : ৮৯টি
সর্বোচ্চ : ১৮৪ রান
একদিনের ম্যাচ : ১৭৪টি
রান করেছেন : ৬৪৭১
শখ : গল্ফ খেলা
(পাকিস্তান সিরিজের আগে পর্যন্ত)

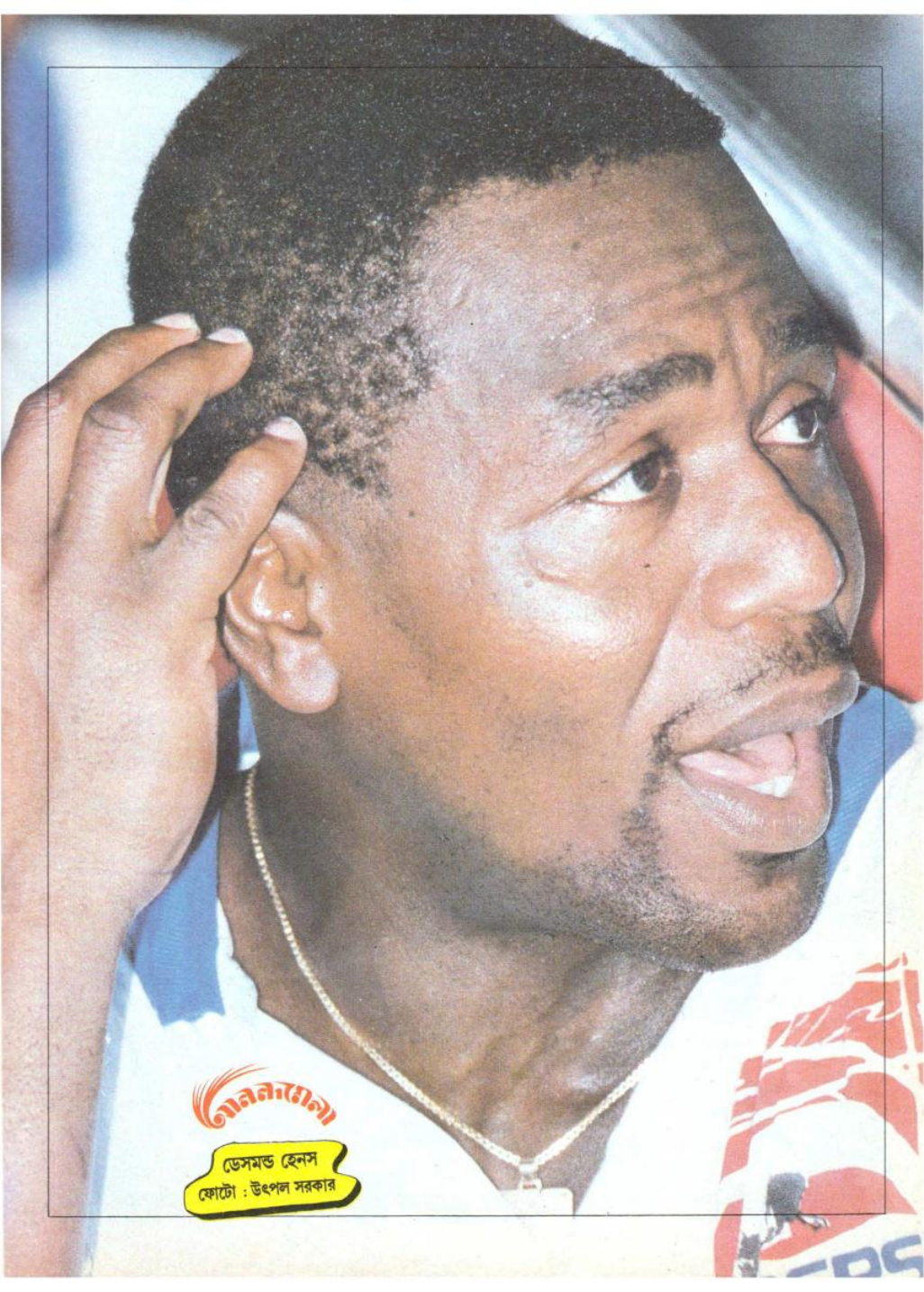
আনন্দমেলা
ডেসমন্ড হেনস
ফোটো : উৎপল সরকার

Cuddles always

say "I love you."

Show your little ones how much you love them! And is there a better way of doing that than giving them a huggable, cuddlable playmate?

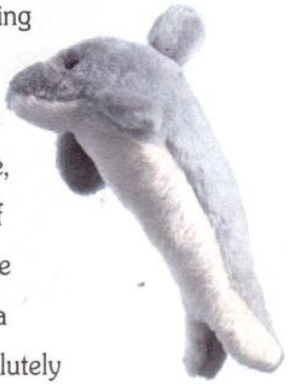

Cuddles. From the people who have given children the delightful entertainer of a magazine, Chandamama. Cuddles. A whole new range of stuffed toys. And, your old favourites. And, cute surprises being introduced regularly. Each one a sweet, adorable companion to your child. Absolutely safe. Designed to withstand childhandling.

Well, the fun and excitement of the festive season is just round the corner. Make it memorable for your child with a special gesture. With a Cuddle.

- CUDDLES — Stuffed toys from Chandamama.
- SAMMO — Mechanical and electronic toys from Chandamama.

CUDDLES

Manufactured in technical collaboration with Sammo Corporation, South Korea.

CHANDAMAMA TOYTRONIX

Chandamama Toytronix Private Limited,
Chandamama Buildings, 188, NSK Salai, Vadapalani, Madras - 600 026.

Distributor : **Sunil & Co.,** 72, Biplabi Rashbehari Basu Road, First Floor, Calcutta - 700 001. Ph.: 255865.

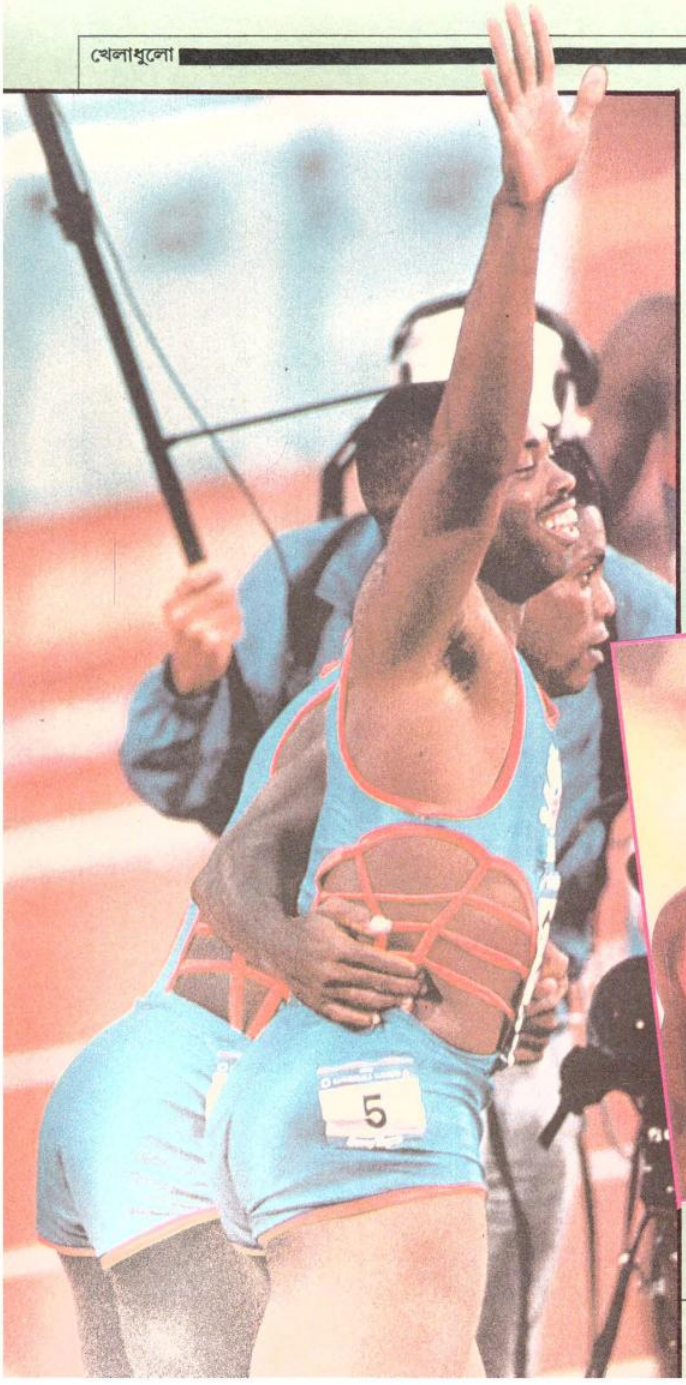

সেরাদের চ্যালেঞ্জ জানাবেন বুরেল

একশো মিটার দৌড়ে লুইস, জনসনদের সঙ্গে উচ্চারিত হচ্ছে আরও কয়েকটি নাম। এঁদের মধ্যে উজ্জ্বলতম হলেন বুরেল। আলোচনা করেছেন **সমীরণ সেন**

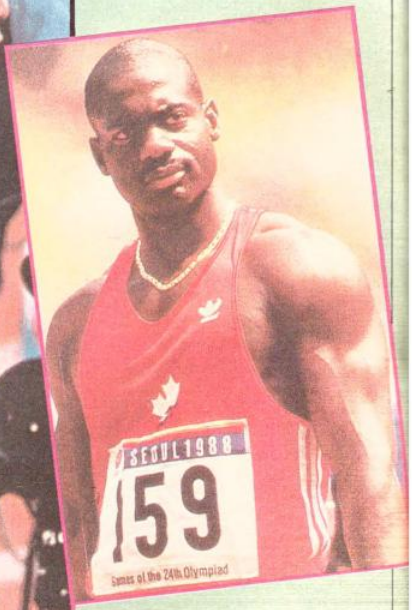

কার্ল লুইসের বেল্টনীতে কি ভবিষ্যতের চ্যাম্পিয়ান বুরেল (বাঁয়ে)? বেন জনসনকেও (ওপরে) পরীক্ষায় ফেলবেন বুরেল

এখন আর দ্বৈত সংগ্রাম নয়। আসরে নয়-নয় করেও ছ'জন হাজির। পৃথিবীর দ্রুততম দৌড়বীর কে? একশো মিটার দৌড়ের লড়াইটা বেশ কিছুদিন ছিল কার্ল লুইস ও বেন জনসন, এই দু'জনের মধ্যে। সোল ওলিম্পিকের পর দু' বছর প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে পারেননি বেন, সে-সময় মাঝেমধ্যে হারলেও সেরা ছিলেন কার্ল লুইসই। কিন্তু কতদিন আর তাঁকে সেরা বলা যাবে? ব্রিটেনের লিনফোর্ড ক্রিস্টি, জন রেগিস এবং জ্যাসন লিভিংস্টোন প্রচণ্ড ভাল দৌড়চ্ছেন, নির্বাসনের পর ফিরে এসেছেন বেন জনসন। আর সবাইকে চমকে দিচ্ছেন আমেরিকার তরুণ লিরয় বুরেল। দু'বছর পর আগামী বার্সিলোনা ওলিম্পিকে যদি 'দ্রুততম মানুষ'-এর সম্মান পান বুরেল, তবে সেটা আশ্চর্যজনক কিছু হবে না।

টেক্সাসের হাউসটন বিশ্ববিদ্যালয়ের যোগাযোগ বিভাগে পড়াশোনা করেন বুরেল। তেইশ বছরের এই তরুণের ওপর বিশেষজ্ঞদের আস্থা রাখার অনেক কারণ আছে। পড়াশোনায় যেমন তিনি ভাল, তেমনই দৌড়েও এ-বছর অনেক চমকপ্রদ কাণ্ড করেছেন তিনি। ১০০ মিটার দৌড়ের ২২টি প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়েছিলেন। হেরেছেন মাত্র ২টিতে। এর মধ্যে আছে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক ৯টি গ্রাঁ প্রি প্রতিযোগিতা। প্রতিটি প্রতিযোগিতায় তিনি জিতেছেন। এই জয় সত্যিই চমকপ্রদ। অনেকেই তাঁকে এ-বছরের অবিসংবাদী সেরা দৌড়বীর বলে ঘোষণা করেছেন।

বুরেল এ-বছর যাঁদের হারিয়েছেন তাঁদের মধ্যে সেরা হলেন গতবারের ওলিম্পিক চ্যাম্পিয়ান এবং বর্তমানের এক নম্বর কার্ল লুইস। মজার কথা, লুইস হলেন বুরেলের আদর্শ, প্রধান পরামর্শদাতা এবং সেন্ট মোনিকা ট্র্যাক ক্লাবে তাঁর সতীর্থ। লুইস বুরেলের কাছে হার মেনেছেন একবার, অ্যাথেন্স গ্রাঁ প্রি প্রতিযোগিতায় এবং অন্যবার কমনওয়েলথ গেমসে।

এ-বছর বুরেলের ১০টি দৌড়ের গড় সময় হচ্ছে ৯·৯৯ সেকেন্ড। এর মধ্যে দুটিতে দৌড়েছেন ৯·৯৪ সেকেন্ডে, একটিতে ৯·৯৫, দুটিতে ৯·৯৬, একটিতে ১০·০০, একটিতে ১০·০১, একটিতে ১০·০৪ এবং দুটিতে ১০·০৫ সেকেন্ডে। একমাত্র কার্ল লুইসই ১৯৮৮-তে এর থেকে ভাল গড় করেছিলেন, ৯·৯৫ সেকেন্ডের। বুরেল প্রায় কাছাকাছি গিয়েছেন।

দ্রুত দৌড়ে বিশ্বরেকর্ড কার্ল লুইসের। ১৯৮৮-র সোল ওলিম্পিকে তিনি সময় করেছিলেন ৯·৯২ সেকেন্ড। এর আগে তা ছিল আমেরিকারই কলভিন স্মিথের। ১৯৮৩-তে কলোরাড স্প্রিংস-এ তাঁর সময় ছিল ৯·৯৩ সেকেন্ড। বুরেলের আশা, তিনি লুইসের রেকর্ড ভাঙতে পারবেন। কেননা গত বছর চ্যাম্পিয়ানশিপে তিনি দৌড়েছেন ৯·৯৪ সেকেন্ডে। বুরেল বলেছেন, "আমার লক্ষ্য শুধু জয় নয়, বিশ্বরেকর্ড করা এবং আশা করি বার্সিলোনাতেই তা করতে পারব।"

আর-এক প্রতিদ্বন্দ্বী বেন জনসনও পিছিয়ে নেই। তিনি বলেছেন, সোল ওলিম্পিকে তাঁর করা ৯·৭৯ সেকেন্ড ড্রাগ নেওয়ার অভিযোগে বাতিল হয়েছে ঠিকই, তবে আবার তিনি ওই সময়ই করে বিশ্বরেকর্ড করবেন। ব্রিটেনের ২৬ বছর বয়স্ক লিনফোর্ড ক্রিস্টি-র যদিও এ-বছরটা তেমন ভাল যায়নি, তবে তিনিও অকল্যান্ডে কমনওয়েলথ গেমসে ৯·৯৩ সেকেন্ডে দৌড়েছিলেন। তাঁর আশা, তিনিও লড়াইতে শিগগিরই ফিরে আসবেন।

উনিশ বছরের ব্রিটেনের দৌড়বীর জ্যাসন লিভিংস্টোন যদিও এখন ১০ সেকেন্ডের বেশি সময় নিচ্ছেন, কিন্তু তাঁর টেকনিক দেখে অনেকেই বলছেন, অচিরেই বিশ্বরেকর্ড করার দাবিদার হয়ে উঠবেন তিনি। ইংল্যান্ডের জন রেগিসও প্রচণ্ড আস্থাবান। তিনি বলেছেন, "স্টার্ট ভাল নিতে পারার অনুশীলন করছি। সফল হলে অনেককে আমিও অস্বস্তিতে ফেলব।"

সুতরাং এক নম্বর হওয়ার লড়াই জমজমাট। আছেন আরও অনেক তরুণ। কিন্তু দ্রুততম দৌড়বীর হওয়ার ক্ষেত্রে পাল্লা ভারী বুরেলেরই। জনসন এবং লুইসকে সত্যিকারের চ্যালেঞ্জ জানাবেন তিনি। বার্সিলোনা ওলিম্পিকের আগেই যদি এই চ্যালেঞ্জে জিতে যান বুরেল, তা হলেও হয়তো বলার কিছু থাকবে না।

একশো মিটার দৌড়ে লুইসকে পেছনে ফেলে দিচ্ছেন বুরেল

অনেকেই বুরেলকে এ-বছরের অবিসংবাদী সেরা দৌড়বীর বলে ঘোষণা করেছেন। বুরেল এবছর যাঁদের হারিয়েছেন তাঁদের মধ্যে সেরা হলেন গতবারের ওলিম্পিক চ্যাম্পিয়ান এবং বর্তমানের এক নম্বর কার্ল লুইস।

এখন হোলিফিল্ডই সেরা

হেভিওয়েট বক্সিংয়ে বিশ্বচ্যাম্পিয়ান জেমস বাস্টার ডগলাসকে খেতাবচ্যুত করলেন ইভান্ডার হোলিফিল্ড। এখনও পর্যন্ত একটি লড়াইতে হারেননি তিনি। তাঁকে নিয়ে লিখেছেন কাজল চক্রবর্তী

খবরটা শুনে অনেকে প্রথমে বিশ্বাসই করতে পারেননি। সত্যি-সত্যি বিশ্বাস করার কোনও কারণও ছিল না। কেননা কয়েক বছর ধরে এর উলটো কাণ্ডটাই তো হচ্ছিল। প্রবল শক্তিধর মাইক টাইসন হেরেছেন—এটা তাই অবিশ্বাস্যই মনে হচ্ছিল। এতদিন অন্য বক্সাররা টাইসনের সঙ্গে লড়াইয়ে নামলে একটা দিকেই নজর রাখতেন, প্রথম রাউন্ডেই না নক আউট হয়ে যান! যে করে হোক লড়াইয়ের সময়টা দীর্ঘ করে অন্তত কিছুটা সম্মান নিয়ে রিং থেকে বেরিয়ে আসাই তাঁদের লক্ষ্য ছিল। অথচ এক-একটা প্রচণ্ড ঘুসিতে তাঁদের সে আশা মাটিতে মিশিয়ে দিতেন টাইসন। এরকমই চলছিল। সবাই ভেবে নিয়েছিলেন হেভিওয়েট বক্সিংয়ে মাইক টাইসন অপরাজেয়। কিন্তু এ-বছরের ফেব্রুয়ারিতে টোকিওতে অপরাজেয়র 'অ'-টি সমূলে উৎপাটিত করলেন ডগলাস। খেতাব লড়াইয়ে হারিয়ে দিলেন টাইসনকে। আর এই অঘটনটি ভাল করে উপভোগ করার আগেই ডগলাস হারলেন দ্বিতীয় লড়াইতেই। টাইসন বিজেতাকে হারালেন হোলিফিল্ড। হোলিফিল্ডের কাণ্ডটিকে তা হলে কী বলা উচিত? অঘটনের অঘটন!

আমেরিকার লাস ভেগাসের যে হোটেলটিতে এই উত্তেজনাপূর্ণ লড়াইটি হয়, সেখানে উপস্থিত ছিলেন হলিউডের বিশিষ্ট কয়েকজন চিত্রতারকাসহ বেশ কয়েক হাজার দর্শক। কিন্তু তাঁদের তেমন সংশয়ে রাখেননি হোলিফিল্ড। মাত্র তিন রাউন্ডেই ডগলাসকে রিংয়ে শুইয়ে দেন তিনি। তৃতীয় রাউন্ডে এমন ঘুসি মারেন যে, ১ মিনিট ১০ সেকেন্ড অজ্ঞানই হয়ে থাকেন ডগলাস। জ্ঞান ফিরে ডগলাস দেখেন, তিনি 'প্রাক্তন' বিশ্বচ্যাম্পিয়ান হয়ে গেছেন, খেতাবচ্যুত হয়েছেন। ধরাধরি করে রিংয়ের বাইরে নিয়ে আসতে হয় তাঁকে।

প্রথম দুটো রাউন্ডেও খুব একটা সুবিধে করতে পারেননি ডগলাস। একেবারেই ফর্মে ছিলেন না তিনি। আঠাশ বছরের হোলিফিল্ড প্রথম থেকেই তাঁকে অস্বস্তিতে ফেলেন। তৃতীয় রাউন্ডে হোলিফিল্ডের ডান হাতের একটি দুর্দান্ত জ্যাব আছড়ে পড়ে জেমস ডগলাসের মুখে। ক্যানভাসের ওপর পড়ে যেতে-না-যেতেই এবার সজোরে লেফট আপার কাট। কাটা গাছের মতো পড়ে যান ডগলাস। চনমনে হোলিফিল্ড তখন আর-একটি ঘুসি মারার জন্য প্রস্তুত। ডগলাসের সৌভাগ্য, সেটি আর তাঁকে হজম করতে হয়নি।

কয়েক মাস ধরেই ডগলাসের প্রধান সমস্যা ছিল তাঁর ওজন। রিংয়ে নামার আগে তাঁর ওজন ২৪৬ পাউন্ড বা ১১১·৬ কেজিতে পৌঁছয়। এই বিশাল ওজন নিয়ে নড়াচড়া করাই শক্ত, ক্ষিপ্র গতি তো দূরের কথা। বক্সার সুগার রে লিওনার্ড। তিনিও বলেছেন, "ডগলাস এই ওজন নিয়ে একেবারেই লড়াইয়ের মধ্যে ছিল না এদিন।" নেভাদা স্টেট অ্যাথলেটিক কমিশনের সদস্য দুয়ান ফোর্ড মন্তব্য করেছেন, "লড়াইয়ের আগে আমি ডগলাসের ড্রেসিংরুমে গিয়েছিলাম।

ডগলাসকে (বাঁ দিকে) খেতাবচ্যুত করছেন হোলিফিল্ড

ওজন বেশি হওয়ায় খুশি হয়েছিলেন ডগলাসের ম্যানেজার জন জনসন। তিনি দম্ভের সুরে বলেছিলেন, "ওজন বেড়েছে তো কী হয়েছে, ওর ঘুসির জোরও বেড়ে গেল। হোলিফিল্ডকে দাঁড়াতেই দেবে না ডগলাস।"

হোলিফিল্ডের ট্রেনার লেট দুভো কিন্তু যথার্থই বলেছেন, "ওই ওজন নিয়ে কেউ খেতাব ধরে রাখতে পারে না।" হোলিফিল্ড জেতার পর তিনিই আবার বলেন, "১১১·৬ কেজি শোওয়া আর আরাম করার পক্ষে ভাল। কিন্তু লড়াই করার পক্ষে নয়।"

টেলিভিশনে ধারাভাষ্য দিচ্ছিলেন প্রাক্তন দেখলাম টেবিলে অঘোরে ঘুমোচ্ছে বিশ্বচ্যাম্পিয়ান। তখনই বুঝেছিলাম, 'প্রাক্তন' শব্দটি ওর নামের আগে বসতে আর বিশেষ সময় লাগবে না।"

হোলিফিল্ড অবশ্য ওজন, ফর্মে না থাকা এসবকে পাত্তা দিতে রাজি নন। তাঁর মতে, "আমি যে-কোনও সময়ে ওকে হারাতে পারি।" পরপর ২৫টি লড়াইয়ে জয়ী হোলিফিল্ড এ-কথা বলতেই পারেন। কেননা এই জয়টিই এখন পর্যন্ত তাঁর সেরা জয়, টাইসন-জয়ীকে হারিয়েছেন তিনি, বিশ্বচ্যাম্পিয়ানের মুখে তাই এ-কথা শুনতে খারাপ লাগে না।

পেনাল্টি বাঁচানোয় সেরা ছিলেন শিবাজি

খেলতে গিয়ে নানা অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছেন বাংলার বিশিষ্ট গোলরক্ষক শিবাজি ব্যানার্জি। তাঁর সেইসব চমকপ্রদ অভিজ্ঞতা নিয়ে লিখেছেন প্রবীর বসু

কলকাতা মাঠের প্রথম পেনাল্টি বিশেষজ্ঞ গোলরক্ষক কে ? এই প্রশ্নে দ্বিতীয়বার ভাবনার কোনও দরকার নেই। সত্তর দশকের ফুটবল সম্বন্ধে যাঁদের সামান্য ধারণা আছে, তাঁরাই একবাক্যে বলবেন একটি নাম—শিবাজি ব্যানার্জি। সেদিনের লম্বা ছিপছিপে তরুণ শিবাজি আজ একটু ভারিক্কি হয়েছেন চেহারায়, কথাবার্তায় এখনও কিন্তু সেরকমই চনমনে। গতবারের বাংলা দলের সহকারী কোচ শিবাজি শোনাচ্ছিলেন পেনাল্টি বাঁচানোর নানা মজাদার, চমকপ্রদ অভিজ্ঞতার কাহিনী।

মোহনবাগান ক্লাবে খেলার সময় শিবাজি একটি অনন্য রেকর্ড গড়েন। এখনও তা অটুট। ভবিষ্যতেও তা কেউ ভাঙতে পারবেন কি না সন্দেহ আছে। সত্তরের দশকের শেষের দিকে মোহনবাগান দশটি টুর্নামেন্টে জয়লাভ করে, দশটিই গড়ায় টাই-ব্রেকার পর্যন্ত। এবং প্রত্যেকটিতে জেতান শিবাজি ব্যানার্জি। একটি-না-একটি গোল বাঁচিয়ে দিয়ে তিনি দলকে উদ্ধার করেন।

টাই-ব্রেকারে জয়ের মীমাংসা সত্তর দশকেই কলকাতায় শুরু হয়। এবং শুরু থেকেই এ ব্যাপারে পটু হয়ে ওঠেন শিবাজি। মূল খেলায় ফিল্ড গোল খেলেও পেনাল্টিতে যে শিবাজিকে কাবু করা সহজ নয়, তা তখনকার সব ফুটবলারই জানতেন।

শিবাজি শোনালেন ১৯৮০ সালের ফেডারেশন কাপের সেমিফাইনালের কথা। কলকাতার দুই প্রধান মহমেডান-মোহনবাগান খেলছেন। খেলা-শেষের তিন মিনিট আগে মাঠে ডাক পড়ল শিবাজির। কেননা খেলা তখনও অমীমাংসিত। অবধারিতভাবে তা গড়াচ্ছে পেনাল্টির দিকে। মজার কথা, এই ধরনের খেলার সময় খুব একটা সুযোগ পেতেন না শিবাজি। কিন্তু টাই-ব্রেকার হলেই তিনি রক্ষাকর্তা। সুতরাং শেষের তিন মিনিট আগেই তড়িঘড়ি তলব। মাঠে নেমে আবিষ্কার করলেন, যে-বুট পরে এসেছেন তিনি, তা বেশ ছোট এবং সেটি শ্যাম থাপার। মহা মুশকিল হল, কিন্তু কী আর করা ! সেটি পরেই দাঁড়িয়ে পড়লেন টাই-ব্রেকারে দলকে উদ্ধার করতে। চিন্ময় চ্যাটার্জি তখন খুব ভাল পেনাল্টি মারতেন। শিবাজির সঙ্গে একই অফিসে চাকরি করেন। শিবাজি জানতেন, চিন্ময়ের প্রবণতা ডান দিকে মারার। কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে এটাও ভেবে নিলেন, চিন্ময়ও জানেন যে এটা শিবাজি জানে। সুতরাং চিন্ময় এবার ইচ্ছা করেই বাঁ দিকে মারবেন। শিবাজি গোলের বাঁ দিকটা ছেড়ে দাঁড়ালেন, চোখ রাখলেন ডান দিকে। অথচ প্রস্তুতি নিলেন বাঁ দিকে ডাইভ দেওয়ার। শিবাজির গোল ছাড়া এবং চোখের দিকে তাকিয়ে নিশ্চিত চিন্ময় ফাঁদে পড়ে গেলেন। মারলেন বাঁ দিকে। এবং যা হওয়ার তাই হল। উল্লাসে ফেটে পড়ল সারা ইডেন গার্ডেন্স।

তেমন কিছু উচ্চ মানের গোলরক্ষক না হয়েও শিবাজি কী করে পেনাল্টি বাঁচানোয় সেরা হয়ে উঠলেন ? শিবাজির বক্তব্য, পেনাল্টি বাঁচাতে সবচেয়ে আগে দরকার গোলকিপারের নিজের ওপর আস্থা। দ্বিতীয়ত, যিনি মারবেন কিকটা, তাঁর ওপর

পেনাল্টি বাঁচাচ্ছেন শিবাজি

প্রভাব বিস্তার করতে হবে, তাঁর মানসিকতা কী, তা দেখে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। তাঁর চোখের দিকে সরাসরি তাকিয়ে থেকে, চোখের ইঙ্গিতে বিভ্রান্ত করতে হবে।

যাঁরা পেনাল্টি মারতেন, তাঁদের মধ্যে সেরা মনে হয়েছে কাকে ? শিবাজির জবাব, "অনেকেই ভাল মারত। তবে সেরা মজিদ বাসকার। কিছুতেই আমার চোখের দিকে তাকাত না। আর মারার শেষ মুহূর্তে পা'কে ঘুরিয়ে বলের গতিপথ পরিবর্তন করে দিত। ফলে কোন দিকে ঝাঁপাব বুঝতে খুব অসুবিধে হত।"

নিজের রিফ্লেক্স বুদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে যেমন গোল বাঁচিয়েছেন, তেমনই অবিশ্বাস্যভাবে গোল বেঁচেও গেছে শিবাজির। আটাত্তর সালের ফেডারেশন কাপে আই· টি· আই-এর সঙ্গে খেলা। দ্বিতীয় দিনেও নির্ধারিত সময়ে মীমাংসা না হওয়ায় অনিবার্যভাবে শুরু হল টাই-ব্রেকার। সেখানেও দু' দল সমান গোল করল। অগত্যা 'সাডেন ডেথ' করতে হল। শট মারতে এলেন বিপক্ষের গোলরক্ষক সুন্দরশরণ। প্রচণ্ড জোরে মারতেন। শট উড়ে আসছে। শিবাজি হঠাৎই পড়ে গেলেন ডান দিকের বদলে বাঁ দিকে। অবধারিত গোল। কিন্তু কী আশ্চর্য। বল জমা পড়ল বাঁ দিকেই, শিবাজির বুকে। আজও শিবাজি জানেন না কীভাবে গোলরক্ষা হয়েছিল।

চমকপ্রদ এবং সেরা গোল বাঁচিয়েছেন শিবাজি আটাত্তরেই, ডুরান্ড সেমিফাইনালে, জে· সি· টি-র বিপক্ষে। ম্যাচে প্রচণ্ড চাপ থাকায়, পেনাল্টির সময় মাথা কাজ করছিল না শিবাজির। চমৎকারভাবে প্রথম গোল করলেন হরজিন্দর সিং। আরও দুটি গোল আটকানো গেল না। চতুর্থটি আটকাতে না পারলে বিদায় নেবে মোহনবাগান। মারতে এলেন পারমার। কিন্তু শিবাজির চোখের দিকে পারমার তাকিয়ে কী বুঝলেন কে জানে ! তড়িঘড়ি যে শট মারলেন, এসে পড়ল শিবাজির হাতে। আবারও জিতলেন শিবাজি !

রেফারিদের রাজত্ব কি শেষ হতে চলেছে

এখনও ফুটবল মাঠের সর্বেসর্বা হলেন রেফারি। তাঁদের ভুল সিদ্ধান্তে ক্ষতিগ্রস্ত দলগুলি বিকল্প ব্যবস্থা চাইছে। আলোচনা করেছেন সুজিত রায়

খেলা চলছিল চ্যাম্পিয়ানস কাপের। সেমিফাইনালের দুই প্রতিপক্ষ ছিল বেনফিকো এবং মার্সেই ক্লাব। খেলা-শেষের সাত মিনিট আগে হঠাৎই একটি কর্নার পায় বেনফিকো। চমৎকার একটি সেন্টার করেন ভালদো এবং তা থেকে গোল করেন ভাটা। রেফারি ভ্যান ল্যানগেনহোভ গোলের নির্দেশ দেন। মার্সেই-এর সমস্ত ফুটবলার ঘিরে ধরেন রেফারিকে। তাঁদের বক্তব্য, ভাটা হাত দিয়ে গোল দিয়েছেন। রেফারি বলেন, গোলটি হয়েছে বুক দিয়ে। ন্যায্য না অন্যায্য, যখন এই নিয়ে তর্ক চলছে স্টেডিয়াম জুড়ে, তখন কিন্তু নানা কোণ থেকে তোলা টেলিভিশনের রিপ্লেতে দেখা যায়, ফুটবলারদের কথাই ঠিক, ভুল করেছেন রেফারি। কিন্তু ততক্ষণে যা ক্ষতি হওয়ার তা হয়ে গিয়েছে মার্সেই ক্লাবের। তাঁরা হেরে বসে আছেন ওই একটি গোলেই।

রেফারি ল্যানগেনহোভ কিন্তু স্বীকার করেননি তিনি ভুল করেছেন। তাঁর কথা, "আমি যা দেখেছি, তার ভিত্তিতেই সিদ্ধান্ত নিয়েছি।" তাঁর এই কথায় আগুনে যেন ঘি পড়েছে। সারা ইউরোপ জুড়ে শুরু হয়েছে তুমুল আলোড়ন। ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী মিশেল রোকার্ড পর্যন্ত চটেছেন। মার্সেই ক্লাবের প্রেসিডেন্ট বার্নার্ড তাপিকে লেখা এক চিঠিতে তিনি বলেছেন, "এই ধরনের গুরুত্বপূর্ণ খেলায় কেন একজন লোকেরই ওপর ভরসা রাখা হবে ? আধুনিক যন্ত্রপাতিকে কাজে লাগানো হচ্ছে না কেন ?"

বিশ্বকাপেও রেফারিরা মারাত্মক কয়েকটি ভুল করার পর একই প্রশ্ন উঠেছে অনেকের মনে। তাঁদের যুক্তি, অ্যাথলেটিকস, ক্রিকেটের মতো খেলায় যদি আধুনিক যন্ত্রপাতিকে কাজে লাগানো হয়, তবে ফুটবলে নয় কেন ? ফুটবল বর্তমানে অন্যতম সেরা পেশাদার ও অর্থকরী খেলা। দর্শকসংখ্যাও ফুটবলে সবাধিক। সুতরাং এই খেলায় ভুল কম হওয়াই বাঞ্ছনীয়। অথচ একা রেফারির হাতে পুরো মাঠের রাজত্ব ছেড়ে দিলে ভুল বেড়ে যাওয়ারই সম্ভাবনা। এটা বন্ধ করার জন্য অবিলম্বে বিকল্প ব্যবস্থা তথা ক্লোজ সার্কিট টিভি সহ আনুষঙ্গিক যন্ত্রের সাহায্য নেওয়া প্রয়োজন।

রেফারির সব সিদ্ধান্তই কি ঠিক

কেউ-কেউ প্রস্তাব দিয়েছেন, মাঠের বাইরে একজন রেফারি থাকুন। কোনও বিতর্কিত ব্যাপার হলেই তিনি টিভিতে দেখে মাঠের রেফারিকে সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেবেন। এতে সিদ্ধান্তও চটপট নেওয়া যাবে, ভুলও হবে না।

এই যুক্তিগুলো কারও-কারও পছন্দসই নয়। তাঁরা বলেন, এই ধরনের ব্যবস্থা নিলে রেফারি মাঠে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়বেন। আর-একটা ব্যাপারও আছে, বিশ্ব জুড়ে তা হলে দু' ধরনের ফুটবল চালু হবে। যাঁদের অর্থ আছে, তাঁরাই এইসব অত্যাধুনিক যন্ত্রের সাহায্য নিতে পারবেন, কিন্তু তৃতীয় বিশ্বের অধিকাংশ দেশকেই পুরনো নিয়ম আঁকড়ে থাকতে হবে। এটা ফুটবলের স্বার্থে ভাল নয়।

যুক্তি, পালটা যুক্তি অনেক আছে। কিন্তু এটা সত্য, ফুটবলের স্বার্থেই কখনও-কখনও নিয়মের পরিবর্তন দরকার। আর ভিডিও ফিল্মকে যে ফুটবলের কাজে একেবারে লাগানো হচ্ছে না, তাও নয়।খেলোয়াড়দের শাস্তি দেওয়ার ক্ষেত্রে অনেক সময়ই ফিল্ম দেখে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। গত বছর আর্সেনাল ক্লাবের পল ডেভিসকে সাসপেণ্ড করা হয় সাউদাম্পটনের এক ফুটবলারকে ঘুসি মারার অভিযোগে। রেফারিকে এই আক্রমণের দৃশ্য ধরা পড়ে ভিডিওতে।

সুতরাং বোঝা যায় মাঠে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার সামগ্রিক কাজে যন্ত্রের চোখ কতখানি কার্যকর। সুতরাং রেফারির হাতেই যে এখন মাঠের সর্বময় কর্তৃত্ব, এ-কথা মনে করার কোনও কারণ নেই। বিকল্প ব্যবস্থার সন্ধান করাই উচিত। রেফারিদের ভুলে বিরক্ত ফিফার মতো বিশ্ব সংগঠনও। এ-নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরুও করেছেন তাঁরা।

ফিল্মে অশ্বিনী

বেজিং এশিয়ান গেমসে 'নায়িকা' হওয়ার মতো তেমন কিছু না করলেও অ্যাথলেট অশ্বিনী নাচাপ্পা এখন নায়িকা হতে যাচ্ছেন। আন্তর্জাতিক স্তরে তেইশ বছরের অশ্বিনীর সাফল্য বলতে বেজিং-এ রিলেতে একটি রুপো লাভ। জাতীয় স্তরে অবশ্য উষার পরই সফল মহিলা অ্যাথলেটের নাম অশ্বিনী নাচাপ্পা। অশ্বিনী এখন ফিল্মেও সাফল্য পেতে চান।

একটি তেলুগু ফিল্মে কাজ শুরু করেছেন তিনি। এক তরুণী অ্যাথলেটের প্রবল সংগ্রাম, পরিশ্রম ও লড়াইয়ের পর অবশেষে সাফল্যলাভের কাহিনী ফিল্মটির উপজীব্য। জাতীয় প্রতিযোগিতার যে দৌড়টিতে অশ্বিনী হারালেন উষাকে, সেটিও রাখা হয়েছে ফিল্মটিতে। ট্র্যাকের অশ্বিনী ফিল্মে কতখানি ভাল 'দৌড়ন' সেটাই এখন দেখার।

অসাধারণ কৃতিত্ব

আঠাশ বছরের জার্মান তরুণী লুসিয়ানা ক্রেফুসিয়া একটি অসাধারণ কৃতিত্বের অধিকারী হয়েছেন। সম্প্রতি তিনি ইংলিশ চ্যানেল পেরোলেন। ইংলিশ চ্যানেল পার হওয়া নিঃসন্দেহে কৃতিত্বের, কিন্তু তা অসাধারণ হবে কেন ? এর আগে বেশ কয়েকজন মহিলাই তো চ্যানেল অতিক্রম করেছেন। আসলে লুসিয়ানার অসাধারণত্বটা অন্য জায়গায়। তাঁর দুটি পা-ই নেই, ছেলেবেলায় এক দুর্ঘটনায় তিনি পা দুটি হারান। কিন্তু মনের জোরে তিনি প্রমাণ করলেন, কোনও বাধাই বাধা নয়। ১২ ঘণ্টা ২৯ মিনিটে ফ্রান্সের উপকূলে পৌঁছে লুসিয়ানা দেখালেন, নিষ্ঠা আর অনুশীলনে সব বাধাকেই অগ্রাহ্য করা যায়।

এখন বর্গ

বিয়র্ন বর্গ আবার আন্তর্জাতিক টেনিস অঙ্গনে ফিরে আসছেন ঠিকই, কিন্তু তাঁর সাফল্য সম্পর্কে ক্রমেই সংশয় বাড়ছে। সম্প্রতি ইতালির মিলানে বর্গ প্র্যাকটিস করছিলেন দুই তরুণ টেনিস খেলোয়াড়ের সঙ্গে। এঁদের একজন, উগো পিগাটোর কাছে চার সেটের খেলায় শুধু হ্যারেননি বর্গ, গেম নিতে পেরেছেন মাত্র তিনটি। বাইশ বছরের পিগাটো এবারের ইতালি চ্যাম্পিয়ানশিপের ফাইনালে উঠেছিলেন। পিগাটো মিলানের খেলার পত্রিকা 'গাজেটা'য় বলেছেন, "বর্গ প্র্যাকটিসে নিঃসন্দেহে উন্নতি করছেন, তবে এখন তাঁর স্থান বিশ্বে প্রথম দশে

নয়, একশোজনের মধ্যে তিনি আসেন।" অপর প্র্যাকটিস-সহযোগী এনরিকো কোচ্চিরও একই মত।

আবার দু'জন

বেন জনসনের কেলেঙ্কারি এখনও অনেককে সতর্ক করতে পারেনি। আশা করা গিয়েছিল, বেনের ড্রাগ নেওয়া ধরা পড়ার পর এই সর্বনাশা ব্যাধি দূর হবে খেলার জগৎ থেকে। কিন্তু সম্প্রতি ইতালির বিখ্যাত ক্লাব রোমা-র দুই ফুটবলার একই অপরাধে অভিযুক্ত হলেন। একজন তো জাতীয় দলের স্ট্রাইকার, আন্দ্রে কার্নেভ্যালি। জাতীয় ফুটবল সংস্থা দু'জনকেই এক বছরের জন্য সাসপেন্ড করেছেন।

বথামের বদলে

দিনকয়েক আগে পর্যন্ত ব্রিটেনের খবরের কাগজ, বিশেষত সান্ধ্য খবরের কাগজগুলির প্রাত্যহিক কাজ ছিল ইয়ান বথামকে নিয়ে সত্য-মিথ্যা নানা খবর ছাপানো। ক্রিকেটার হিসেবেই শুধু নয়, নানা সামাজিক কাজকর্মে জড়িয়ে বথাম প্রায়ই 'হেডলাইন' হতেন। তাঁর কিছু কাজ অবশ্য বিতর্কও সৃষ্টি করেছে। তাই তিনি ইংল্যান্ডে কখনও হিরো, কখনও ভিলেন। এই তিনি হাতিতে চেপে ক্যান্সার সোসাইটির জন্য অর্থ সংগ্রহ করছেন, আবার প্রবল জোরে গাড়ি চালানোর অপরাধে আদালতে হাজিরা দিতে বাধ্য হচ্ছেন। সেই বথামই কিন্তু দলে সুযোগ না পাওয়ায় আর 'খবর' হতে পারছেন না। সেই জায়গা নিয়েছেন তরুণ ফুটবলার পল গাসকোয়েন, গাজ্জা নামেই যিনি বেশি পরিচিত। বিশ্বকাপে দারুণ খেলার জন্য গাজ্জা ইংল্যান্ডে এখন হিরো, বিজ্ঞাপনে গাজ্জা, শার্ট-প্যান্টে তাঁর ছবি। মুখরোচক নানা খবরও প্রত্যেকদিন পরিবেশিত হচ্ছে তাঁকে নিয়ে, পত্রপত্রিকায়। অর্থাৎ, প্রায় সাত-আট বছর সংবাদ শিরোনামায় থাকার পর এই নব্বইয়ে বথামের বদলে গাজ্জা-যুগ শুরু হল বলা যায়।

গোহারির বিদায়

পঞ্চাশ বছর পর যিনি মিশরকে বিশ্বকাপের ফাইনাল পর্যায়ে তুলেছিলেন, মাস কয়েক আগেও যাঁর জনপ্রিয়তা ছিল তুঙ্গে, তাঁকেই

নিঃশব্দে বিদায় নিতে বাধ্য করলেন মিশরের ফুটবল-সংস্থা। আল গোহারি, সেনাবাহিনীর কর্মী হওয়ায় মিশর দলটিতে কোচ হিসেবে এনেছিলেন চরম শৃঙ্খলা। ব্যাপারটা পছন্দ হয়নি অনেক কর্তাব্যক্তির। তাই সম্প্রতি একটি আমন্ত্রণী খেলায় গ্রিসের কাছে ৬-১ গোলে মিশর হারার পর গোহারিকে সরে যেতে বলা হল। গোহারির ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা এখনও জানা যায়নি।

হাতছাড়ার ভয়ে

দুই জার্মানি মিলনের কয়েকদিনের মধ্যেই সে-দেশের ওলিম্পিক সংস্থা সিদ্ধান্ত নিয়েছে, দু' হাজার সালের ওলিম্পিক অনুষ্ঠানের দাবিদার হবে তারা। এর জন্য এক বিলিয়ন ডলার খরচ করতে রাজি সে-দেশ। মাত্র ছ' কিলোমিটার জায়গার মধ্যে পুরো প্রতিযোগিতা হবে, যাতে কারও কোনও অসুবিধে না হয়। এখনই এইসব সুযোগ-সুবিধের কথা প্রচার করা হচ্ছে, যাতে কোনও কারণেই ওলিম্পিক অনুষ্ঠান হাতছাড়া না হয়।

খেলাধুলো

শিবাজি গঙ্গোপাধ্যায়

সোতো মাওয়াসি গেরি

কিওকুশিন ক্যারাটের পা দিয়ে আঘাত করার কৌশল নিয়ে কয়েকটি সংখ্যায় আলোচনা করেছি। আগেই বলেছি ক্যারাটেতে পা দিয়ে আঘাত করার কৌশল কতখানি গুরুত্বপূর্ণ এবং আরও বলেছি যে, কী করলে পায়ের মাংসপেশী এবং সন্ধিস্থল যথেষ্ট পরিমাণে মজবুত হয়ে উঠবে। কারণ পা দিয়ে প্রতিপক্ষকে জোরালো আঘাত করতে হলে পায়ের জোর বিশেষভাবে দরকার। আমার নিজের দেখা দেশের ও বিদেশের প্রতিযোগিতায় দেখেছি যে, বেঁটে চেহারার প্রতিযোগী কত সহজে বলশালী চেহারার প্রতিপক্ষের মুখে পা দিয়ে আঘাত করে ধরাশায়ী করে। এই থেকে বোঝা যায় যে, পা দিয়ে আঘাত করার কৌশল ক্যারাটেতে কতটা গুরুত্বপূর্ণ। আমি এই সংখ্যায় পা দিয়ে আঘাত করার যে কৌশল নিয়ে আলোচনা করব তার জাপানি নাম হল 'সোতো মাওয়াসি গেরি'।

সোতো মাওয়াসি গেরি : এই কথাটার ইংরেজি মানে হল 'আউটসাইড টু ইনসাইড রাউন্ড হাউস কিক'। বাংলায় বলা যেতে পারে বাইরের থেকে ভেতরের দিকে পা দিয়ে ঘুরিয়ে আঘাত করার পদ্ধতি। কিওকুশিন ক্যারাটের পা দিয়ে মারার পদ্ধতিগুলো সাধারণত ইওইদাচি থেকে শুরু করতে হয়। এবারেও ঠিকভাবে ইওইদাচিতে দাঁড়াতে হবে, তারপর হাত দুটো নীচ থেকে ওপরে তুলে এনে মুখের সামনে দু'পাশে মুঠো শক্ত করে মুখ আড়াল করে রাখতে হবে। আগের সংখ্যায় যে পা দিয়ে আঘাত করার পদ্ধতিটা নিয়ে আলোচনা করেছিলাম সেটা ছিল ভেতর দিক থেকে বাইরের দিকে পা দিয়ে ঘুরিয়ে আঘাত করার পদ্ধতি, আর এবারের পদ্ধতিটা হল বাইরের থেকে ভেতর দিকে পা দিয়ে ঘুরিয়ে আঘাত করার পদ্ধতি। এইবার ইওইদাচি থেকে প্রথমে ডান পা-টাকে তুলে নিজের সামনের দিকে বৃত্তাকারভাবে (মুখের থেকেও ওপরের উচ্চতায়) ঘুরিয়ে নীচে নামিয়ে আস্তে মাটি স্পর্শ করে রাখতে হবে। ডান পা মাটি থেকে তোলার পর পায়ের পাতা টানটান অবস্থায় পায়ের পাতার অংশের বাইরের অংশ (আঙুলগুলো ওপরের দিকে, গোড়ালি নীচের দিকে) বাইরের দিকে বেরিয়ে থাকবে। পায়ের পাতা মাটির সঙ্গে উল্লম্বভাবে থাকবে এবং হাঁটুও সোজা থাকবে। যখন ডান পা তুলে অনুশীলন করা হবে তখন শরীরের ওজন বাঁ পায়ের ওপর থাকবে এবং বাঁ পা হাঁটু থেকে একটু মুড়ে থাকবে। বাঁ হাত ওপরে থাকবে, ডান হাত বাইরের দিকে যাবে শরীরের ভারসাম্য ঠিক রাখার জন্য। এইভাবে ডান পা হয়ে গেলে তারপর বাঁ পা দিয়ে এইভাবে প্রতি পায়ে কুড়িবার করে অনুশীলন করতে হবে। এই পদ্ধতিতে প্রতিপক্ষের রগে বা কানের অংশে আঘাত করা যায়, আবার প্রতিপক্ষ হাত দিয়ে কোনও আঘাত করতে এলে এই পদ্ধতিতে প্রতিপক্ষের হাতে আঘাত করে প্রতিপক্ষের আক্রমণ ব্যর্থ করা যায়।

ফোটো : উৎপল সরকার

সবার আপত্তি অগ্রাহ্য করে রয় বয়স্ক টাবি মর্টনকে মেলচেস্টার রোভার্সের গোলে খেলতে ডেকে এনেছে। টাবিকে বাদ দেওয়ার জন্য যখন চাপ বাড়ছে, তখন রয় ওয়ালফোর্ডের সঙ্গে খেলার প্রথম অর্ধে প্রতিপক্ষকে তিন গোলে বিধ্বস্ত করে দ্বিতীয় অর্ধেও ঝড় তুলছে···
এবার ও কোণঠাসা ! ওয়ালফোর্ড ঘিরে ধরেছে !
এমনকী, রেসিও এমন অবস্থায়, নিতান্ত নিরুপায় !
ওহ্, না··· ?
রোভার্সের রয়
ব্ল্যাকি !
আশ্চর্য ! এটা ও কী করে করল ?
রয়, ফিরে আসছি !
ওকে ঘিরে ফ্যালো, হাঁদার দল !
আঁ ?
দেরি হয়ে গেছে !
চার নম্বর !
গোওওওল !
ইয়ায়া ! তোমার এত টাকা কোন কাজে লাগল, রসন ?
জানি, ওয়ালফোর্ডে তুমি রয়ের মতো কাউকে চাও !
তবে ও আমাদের··· আমাদেরই থাকবে চিরকাল !
এই কোটিপতি ব্যবসায়ী সম্প্রতি ওয়ালফোর্ডের চেয়ারম্যান হয়েছেন···
চিরকাল, আঁ ? দেখা যাক ! টাবি মর্টনকে ঘিরে সমস্যাটাই বোধ হয় আমি যা চাই সেই সুযোগ এনে দেবে !
ফুটবল কেমন টাবি সে-কথা ভুলতে শুরু করেছিল
রোভার্স এমন দাপটে খেলছে যে, টাবিকে কিছু করতে হচ্ছে না !
ওর পক্ষে এটা ভালই হয়েছে !

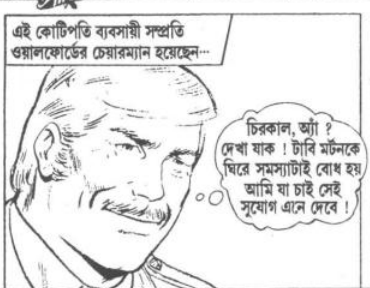

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

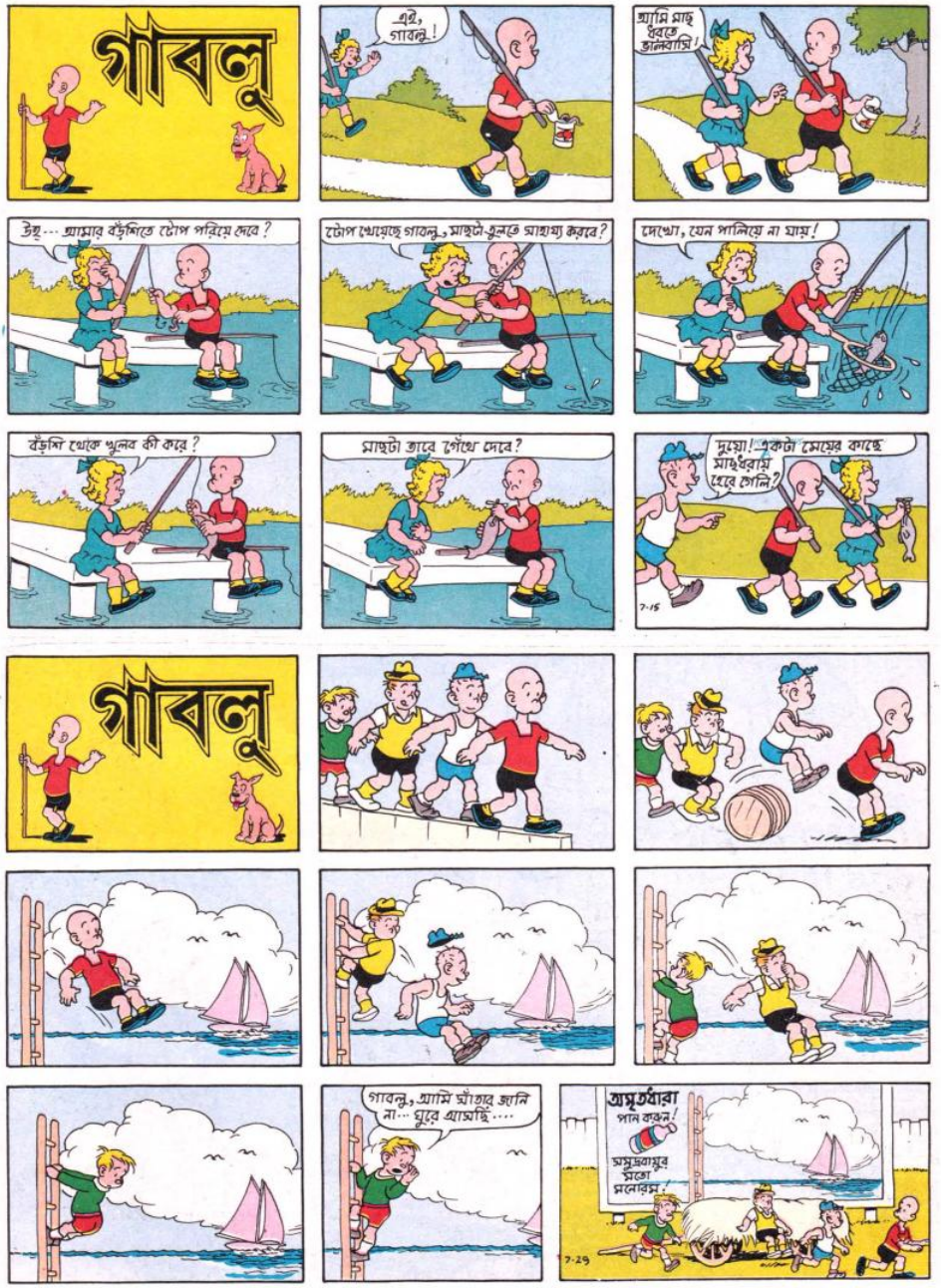

গাবলু
এই,
গাবলু!
আমি মাছ
ধরতে
ভালবাসি!
উহু··· আমার বঁড়শিতে টোপ পরিয়ে দেবে?
টোপ খেয়েছে গাবলু, মাছটা তুলতে সাহায্য করবে?
দেখো, যেন পালিয়ে না যায়!
বঁড়শি থেকে খুলব কী করে?
মাছটা তারে গেঁথে দেবে?
দুয়ো! একটা মেয়ের কাছে
মাছধরায়
হেরে গেলি?
7-15

গাবলু
গাবলু, আমি সাঁতার জানি
না··· ঘুরে আসছি····
অমৃতধারা
পান করুন!
সমুদ্রবায়ুর
মতো
মনোরম!
7-29

(শেষাংশ)

সম্পূর্ণ উপন্যাস

খোঁজা

লীলা মজুমদার

সে যে কী বিশ্রী একটা কান্নার শব্দ, সে আর কী বলব ! যেন অনেকগুলো মানুষ জীবনের সব আশা হারিয়ে ডুকরে কাঁদছে। বার দু'-তিন ওইরকম শব্দ হল। তারপর থমথমে চুপ ! ভিটুর বুকের রক্ত হিম।

সব সাবধানী কথা ভুলে গিয়ে ওই পাঁচটা ছেলেও পরস্পরকে জাপটে ধরে কাঁদতে লাগল। গলা ছেড়ে কাঁদলে ভিটুর অত মন খারাপ হত না। এ হল কেমন একটা বিশ্রী হতাশার কান্না। বড় দুটোতে ঠিক কাঁদেনি, কিন্তু অন্যদের জড়িয়ে ধরে তারা শুধু অদ্ভুত চোখে ভিটুর দিকে তাকিয়ে রইল।

ভিটু নিজের কোমরের দড়ি খুলে ফেলে দিয়ে ওদের বলল, "নড়িসনে তোরা। আমি এক্ষুনি দেখে আসছি কী ব্যাপার।" ওই বলে হ্যাঁচকা টানে সদর দরজার তালা ভেঙে ভেতরে ঢুকে পড়ল। ভিটু ডেকে বলল, "আমি মিনিটে-মিনিটে হাঁক দেব, তোরা সাড়া দিস। আমি ডেকে বলব, 'ও-কে !' তোরা জানবি সব ভাল।"

জালাল-আজিমরা অবাক হয়ে বলল, "কাউকে না দেখলেও বলবে, 'ও-কে ?'"

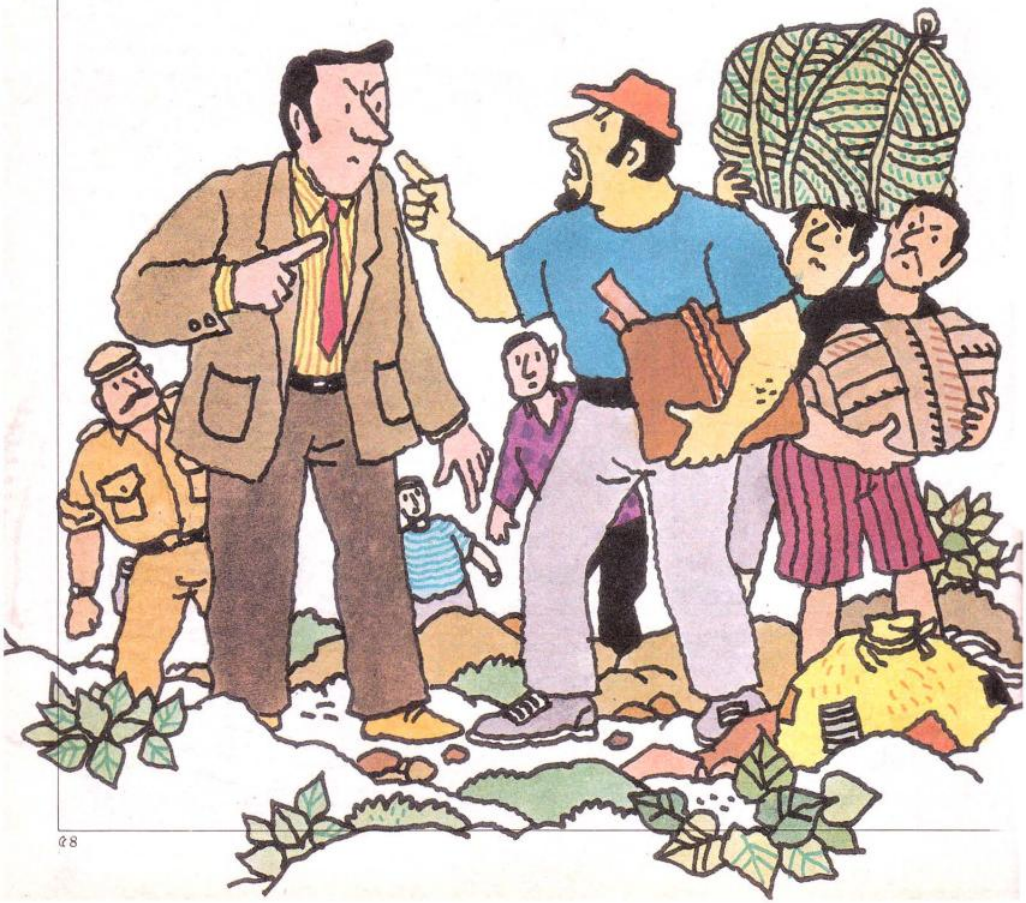

জাপুদা অদ্ভুত গলায় বলল, "মনে পড়ে ও কে এ ওয়াই, ও-কে মানে সব ঠিক। কবে যেন জানতাম কথাটা। যেমন এ বি সি ডি মনে পড়ে। যাও, যাও তুমি ভিতরে। আমরা সজাগ আছি।" ভিটু পকেট থেকে বয়-স্কাউটের বাঁশি বের করে বলল, "এটা ছাড়া আমি এক-পা এগোই না। বাজাতে-বাজাতে সারা বাড়ি ঘুরব। থেকে-থেকে হাঁক দেব। সাড়া দিস তোরা।"

এই বলে কোমরের দড়ির ফাঁস থেকে বেরিয়ে পড়ে, বাঁশি বাজাতে-বাজাতে, খুব জোরে-জোরে পা ফেলে ভিটু, বাড়ির দশটা বড় ঘর, চারটে অকেজো ময়লা ফেলার জায়গা আর চানের ঘর, গোটাছয় ছোট-ছোট ঘর, ভাঁড়ার ঘর, রান্না ঘর, এমনকী, পেছনের দরজার খিল খুলে গোয়াল ঘর আর নফরদের গুদাম ঘর সব দেখে এল। কোথাও কিচ্ছু নেই। কোনও সাড়াশব্দ নেই।

ততক্ষণে সাহস পেয়ে বাকিরাও বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়েছিল কেউ একটা কাগজের কুচি কিংবা ত্যানা সুতো পর্যন্ত খুঁজে পেল না। এত ভাল করে ছাদটা তৈরি যে, এতটুকু টসকায়নি, কোথাও-ও একটু জল সেঁধনোর দাগ ধরেনি। নাকি নব্বই বছর কেউ বাস করেনি, তা সত্ত্বেও এত সাফসুফ দেখে সবাই থ!

যদিও টিফিন খেতে বসে ওরা তাই নিয়ে খানিক হাসাহাসি করেছিল। জাপুদা বলল, "এই তো দিব্যি সুন্দর হলিডে হোম হয়ে আছে। মিনি-মাগনা দল বেঁধে থাকা যাবে। মামু বেজায় ভাল রাঁধেন জানো তো, ভাইয়া? আগে কোনও নামকরা হোটেলে হেড বাবুর্চি ছিলেন কি না কে জানে। আমি হলে এ-জন্মে সে-কাজ ছাড়তাম না। আমি বলেছি এক বছর একটু পড়াশুনো করিয়ে আমাকে কোনও হোটেলের কুকের শাগরেদ করে দিতে। বলেছেন দিতে চেষ্টা করবেন। জানো ভাইয়া, আমার আজকাল অনেক না-জানা কথা মনে পড়ে। তাই-বা কী করে হতে পারে?"

আজিম, নাটু, জালাল একসঙ্গে বলল, "আমরা খালি রোজ পেট ভরে খেতে চাই, যারা বেত মারে, তাদের কাছ থেকে দূরে চলে যেতে চাই।"

ভিটু বলল, "তাই হবে। মা-বাবা পাবে, ভাল খেতে পাবে, জামা-কাপড় পাবে, লিখতে-পড়তে শিখবে।" খিলখিল করে হাসতে লাগল ছেলেগুলো।

ওরা নীচের দোকান থেকে কিনে সঙ্গে আনা ডবল নাস্তা আর মস্ত-মস্ত প্যাঁড়া খেল। ডবল নাস্তা বড় ভাল জিনিস। কুচো নিমকি, চিঁড়ে ভাজা, মুড়ি, ডালমুট, চিনেবাদাম, শসার কুচো, পেঁয়াজ আর কাঁচালঙ্কার কুচো, পাঁচ রকমের ডাল ভাজার সঙ্গে মাখা, আলাদা একটা খুদে শিশিতে ঘানির তেল দিয়ে মেখে খেতে হবে। তারপর সবাই বড় খাওয়াদাওয়ার পর গোপন কুঠরির জন্য ওরা সব ঘরের দেওয়াল মেঝে ঠুকে-ঠুকে দেখেছিল। কোথাও ফোঁপরা শব্দ পায়নি।

আলোয়-আলোয় ফিরতে বলে দিয়েছিলেন মামু। তাই খানিক জল্পনা-কল্পনার পর ওরা আবার ঘরদোর সাফসুতরো করে দিয়ে, দরজা-জানলায় হুড়কো দিয়ে, সদর দরজার মস্ত কড়ার মধ্যে দিয়ে মোটা দড়ি আচ্ছা করে বেঁধে, মামুর কাছে রিপোর্ট দিতে রওনা হল।

তবু বাড়ি ছেড়ে মাটিতে পা দেওয়ার সময় আবার মনে হল যেন অনেক দূরে কোথাও কাদের ছেলেমেয়েরা করুণ সুরে গুমরে-গুমরে কাঁদছে। কেউ কিছু মুখে বলল না, খালি এ-ওর দিকে তাকাল। বাতাসটাকে হালকা করবার জন্য জাপুদা বলল, "কাপ্তেন, আজ বোধ হয় ডিমের খিচুড়ি রাঁধছেন না, নিজে তো নিরামিষ খান। তবে ডিম খান। বলেন ছুটে না বেড়ালে আমিষ হয় না। চলে চল, চলে চল।"

মামু পাহাড়ের নীচে চায়ের দোকানে ওদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। ওদের চা আর চমৎকার বিস্কুট খাওয়ালেন। কিছু জিজ্ঞেস করলেন না। জাপুদা বলল, "খাসা বাড়ি। খুব ভাল হবে। কিন্তু ...."

"কিন্তু কী?"

"কারা কোথায় কাঁদে শোনা যায়। পাতালে বোধ হয়।"

মামু বললেন, "তা কাঁদুক। দুনিয়াতে কোথায় এমন জায়গা আছে

বল, যেখানে দুঃখীরা কাঁদে না ?"

জাপুদা ব্যস্ত হয়ে উঠল, "না, মানে ইয়ে।"

মামু বললেন, "কোথা থেকে কাঁদে বোঝা যায়নি তো ? দেওয়াল মেঝে সব নিরেট আশা করি। ভাল করে দেখে নিয়েছিস ?"

হরিয়াদা হাসল, "সবাই মিলে নেচেকুঁদে দেওয়াল ঠুকে বিতিকিচ্ছিরি কাণ্ড করেছি। যদি ছাদ, দেওয়াল, মেঝে সব নিরেট না হত, তো ওই নাচানাচির চোটেই ফোঁপরা হয়ে যেত। ওই ভৌতিক ব্যাপারটা ছাড়া কোনও খুঁত নেই কোথাও। কিন্তু এমন খোলাখুলিভাবে কি জবরদখল করা যাবে ? আমাদের কাণ্ডকারখানা তো ইদিককার সবাই দেখেছে।"

মামু যেন আকাশ থেকে পড়লেন। "সি কী কথা ! জবরদখল করব কেন ? আমাদের জিনিস বওয়ার অমন ফলাও ব্যবসা! ব্যাঙ্কে তার মোটা টাকা জমা আছে। কাগজে সরকার বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন বেওয়ারিশ জিনিস বলে তাঁরা ওটা অধিগ্রহণ করেছেন। নিলেমে উঠেছিল। ভুতুড়ে সম্পত্তির খদ্দের নেই। আমরা শস্তায় কিনে নিয়েছি। তোদের দেখশুন করতে পাঠিয়েছিলাম। বলিনি বুঝি ?"

ছেলেরা মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। হরিয়াদা বলল, "ওখানে কী করা হবে ?"

"কেন, আপাতত জিনিসের গুদোম হবে।"

ছোট তিনটে বলল, "আমাদের ওখানে থাকতে বোলো না, মামু। কারা যেন কাঁদে। তাদের খুঁজে পাইনি।"

মামু চটে গেলেন, "ব্যস, হয়ে গেল ? কান্না শুনে পালিয়ে যাবি ? তাদের খুঁজে বের করে, কান্না থামাবি না ? তোরা মানুষ, না কেঁচো ?"

ওরা এ-ওর দিকে তাকিয়ে বলল, "তারা ওখানে নেই। আমরা খুঁজে দেখেছি। কেউ নেই, কিছু নেই। খালি একটা তাকের ওপর একটা মস্ত সাপের খোলস ছাড়া কিচ্ছু নেই।"

মামু কড়া গলায় বললেন, "কিচ্ছু নেই যখন, তখন ভয়টা কিসের ? কারা কাঁদে তা খুঁজেও দেখবি না ? কেন কাঁদে, তার কারণটাও দূর করবিনে ? বাঃ ! বেশ তো সব ছেলে বানিয়েছি !"

ভিটু অবাক হয়ে ওদের কথাবার্তা শুনছিল। এতক্ষণে সে কথা বলল, "মামু, কারা কাঁদে তা ঠিকই। তবে পাহাড়ের ভিতরে অনেক সময় ফাটল-ফোকর থাকে। বাইরে থেকে হাওয়া ঢুকে কোথাও সরু ফাটলের মধ্যে দিয়ে বেরোলে বাঁশির মতো শব্দ হতে পারে। তাকে কান্না মনে হতে পারে। কিন্তু অন্য কথা ভাবছি।"

এত কথা চায়ের দোকানে বসে হয়নি। ততক্ষণে ওরা পাড়ি বেয়ে নেমে এসে নৌকোতে চেপেছে। মামু ডিমের খিচুড়ির কথা ভোলেননি। চায়ের দোকানের পাশে নাস্তার দোকান থেকে কয়েকটা কলাপাতা কিনে এনেছিলেন। এতক্ষণে ভিটু বুঝতে পারল পাশের ক'টা খেয়ানৌকোতেও দলের লোকেরা থাকে। তবে ওই পাঁচটি ছেলেকে আর ভিটুকে ঠিক যেন নজরবন্দী করে কাছে-কাছে রাখছিলেন মামু। ভিটুর মনে হচ্ছিল নিশ্চয় ওদের নিরাপত্তার জন্য।

মামু হেসে বললেন, "ডিমের খিচুড়ি আর কিছু নয়, বাপ, প্লেন খিচুড়ি রান্না হয়ে গেলে, তখনও টগবগে গরম থাকবে, কলাপাতা পাকিয়ে, নতুন ঝাঁটা কাঠি দিয়ে এঁটে ওই যে ছোলাভাজার ঠোঙা বানায়, ওই রকম বানিয়ে, তাতে কুচো পেঁয়াজ, লঙ্কা, নুন, আদাবাটা-দেওয়া ডিমের গোলা ঢেলে ঠোঙার মুখ মুড়ে কাটি দিয়ে এঁটে দিবি। ওই টগবগে গরম খিচুড়িতে খুন্তির হাতল দিয়ে ছোট-ছোট গর্ত করে, এক-একটা ডিমের ঠোঙা যত্ন করে এক-একটা গর্তে বসিয়ে, ডেকচি নামিয়ে রাখতে হয়।" খাওয়ার সময় দেখা গেল, ঠোঙাগুলো গরমে কালো হয়ে গেছে। প্রত্যেকের পাতে একটি

করে পড়ল। খুলে দেখা গেল পানের আকারে ডিমের গোলা দিব্যি জমে গেছে আর খেতে লাগল যেন অমৃত। ভিটু অবশ্য কখনও অমৃত খায়নি, তবু তার মনে হল এর চাইতে কখনওই ভাল হতে পারে না।

খুব ঘুম পেয়েছিল, তবু শোওয়ার আগে একটা কথা মামুকে না বললেই নয়।

অসাধারণ বুদ্ধি মামুর। ও যে কিছু বলতে চায়, সেটা আঁচ করে, সবাই শুয়ে পড়লে ওকে কাছে ডাকলেন। বললেন, "কাছে এসে দু-দণ্ড বোস। তোর জলের গেলাসটা নিবি না ?"

নৌকোর টিমটিমে আলোতে বাঁশের চোঙ হাতে নিয়ে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল ভিটু। ওর চারদিক থেকে পাড়িসুদ্ধু নদী, নৌকো, এমনকী স্বয়ং মামু কোথায় মিলিয়ে গেল। নাকে এল বনের গন্ধ, সোঁদা-সোঁদা, ঘাস-পাতার খোশবু মাখা। কানে এল একটা খসখস ফসফস ফোঁস-ফোঁস ! চোখের সামনে দেখা দিল একপাল বুনো হরিণ ভয়ের চোটে পাগলের মতো ছুটছে আর তাদের পেছনে দু'জোড়া পা লম্বা করে দিয়ে বাঘ ছুটছে আর বাঘের পেছনে ধনুকে তীর লাগাচ্ছে ঘাসের ঘাগরা পরা বুনো লোকটা !

তারপর আর কিছু মনে নেই ভিটুর, ঘুম ভেঙেছিল পরদিন ভোরে, মামুর ডাকে। ধড়মড় করে উঠে বসে চেয়ে দ্যাখে বাকি সবাই কখন উঠে গেছে। লজ্জা পেল ভেবে যে ওর আদুরে শরীর এত ঝক্কি সইতে পারছে না। হাত-মুখ ধুয়ে মামুর কাছে বসতেই মামু ওর হাতে এক গেলাস গরম দুধ ধরে দিলেন। দুধ খেয়ে বাঁশের চোঙটা নদীর জলে ধুয়ে রাখল ভিটু। তারপর মামু বললেন, "ডব্লু বি ওয়ান সেভেন নাইন জিরো কার গাড়ির নম্বর ?"

ভিটু চমকে উঠল, "পুরনো কালো অ্যাম্বাসাডর নতুনের মতো চকচকে ?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, চিনিস নিশ্চয় ?"

ভিটু বলল, "গাড়িটা চিনি, মালিকদের চিনি না। ওদের নাম চ্যাউড্রি। টি চ্যাউড্রি। আমাদের বাড়ির একতলায় থাকেন, কিন্তু বাঙালিদের সঙ্গে মেশেন না। অন্তত আমাদের কারও সঙ্গে নয়। সবাই বলে হঠাৎ বড়লোক কিনা, তাই বড্ড অহঙ্কার। নিজেদের মধ্যেও সব-সময় ইংরেজি বলেন। জানো, ওঁরা ইংরেজিতে ঝগড়া পর্যন্ত করেন। এই সমস্ত আমি নিজের কানে শুনেছি। ড্যাম ইউ, এই সব বলেন। খুব খারাপ। হাসছ কেন ?"

"হাসছি, কারণ এইমাত্র পাঙ্কু বলে গেল যে, ডব্লু বি ওয়ান সেভেন নাইন জিরো নম্বরপ্লেটের কালো অ্যাম্বাসাডর এখান থেকে আধ কিলোমিটার দূরে যেখানে পাড়ির খানিকটা ভেঙে পড়েছে, সেখানে অনেকক্ষণ থেকে দাঁড়িয়ে আছে। গাড়ির কাচটাচ তোলা। একটা বেয়াড়া প্যাটার্নের ছোকরা ঠ্যাং ছড়িয়ে, চাকায় ঠেস দিয়ে বসে, বড় বড় হাফ-বিড়ি খাচ্ছে আর দাঁতের ফাঁক দিয়ে শিস দিচ্ছে।"

ভিটু বলল, "ওর নাম জ্যাকি। গাড়িটা চালায়। ওদের কেউ হয় বোধ হয়। রুটিওলা বলেছে ওদের সঙ্গে এক টেবিলে বসে খায়, ও নিজে দেখেছে। আমাদের পাড়ার সক্কলের হাঁড়ির খবর সব্বাই জানতে পারে, কিন্তু চ্যাউড্রিদের কিসের ব্যবসা তা-ই জানে না। তাই কেউ খুশি নয়।"

মামু ওর কাছে এসে বসে বললেন, "কাল ফিরে অবধি কিছু বলার আছে তোর, সেটা আমি টের পাচ্ছি। কিন্তু সবার সামনে বলতে চাস না। এই তো ? এখন বলতে পারবি না ?"

ভিটু বলল, "মামু, ওই কান্নার আওয়াজটা বাতাসের শব্দ নয়।"

মামু বললেন, "আমারও তাই মনে হয়।"

ভিটু বলল, "বাড়ির ভেতরে অনেক নীচে গুমঘর আছে নিশ্চয়। বাড়ির সঙ্গে তার যোগাযোগ নেই। অন্য পথ দিয়ে ঢুকতে হয়। এখন মনে হচ্ছে ওই যেখানে পাড়ি ভেঙেছে সেখানেই বোধ হয়, ঝোপঝাপের আড়ালে, পাথরের চাঁইয়ের ফাঁক দিয়ে ভিতরে যাওয়া-আসার পথ আছে।"

মামু বললেন, "আর গুমঘরে কারা বন্দী আছে। তারাই কাঁদে। ওই গাড়ি ওখানে থাকা মানে চ্যাউড্রিরা ওর সঙ্গে জড়িত। আমরাও তা হলে চুপ মেরে থাকি। ওই গাড়ি ওখান থেকে না গেলে, নট নড়নচড়ন, নট কিচ্ছু। আপাতত আমাদের নতুন কেনা বাড়িটার যেখানে যা সারাবার, ঢাক পিটিয়ে, ফলাও করে সারানো যাক। মালগুদোমের চাহিদা খুব বেশি, তা জানিস ? আজকের দিনটা তুই বরং নৌকোর ছাউনিতে বসে কাগজপত্র দেখিস। গাড়ি গেলে ওপরে যাস। তোকে চিনে ফেললেই সব মাটি। আমি ওপরে যাই।"

ভিটু বলল, "কিন্তু আমাকে তোমার এক টুকরো বাঁশ আর একটা নরুন দিয়ে যেয়ো।"

॥ ৬ ॥

চানটান করে জাপুদা-হরিয়াদার সঙ্গে ছোটগুলো কাপড়চোপড়ের পুঁটলি বগলে রওনা হয়ে গেল। সঙ্গে গেল ইদারা-সাফের লোকজন, যন্ত্রপাতি নিয়ে। হাত-পাম্প বসবে। বাড়িতে বড়-বড় গ্যাসবাতি জ্বলবে। তার নানা সরঞ্জাম গেল সঙ্গে। কাঠের-মিস্ত্রিরা দরজা-জানলা মেরামত করবে। গ্রিল বসবে। পাঁচিল আর ফটক সারাবার মিস্ত্রি খাটবে। মামু বারবার বলতে লাগলেন, "যতটা সম্ভব এই অঞ্চলের কারিগর লাগাবি। পরে যা দেখশুন, মেরামতি, মেন্টেন্যান্স, তারাই করবে। এটুকু আমাদের কর্তব্য।"

ওরা রওনা হয়ে গেলে চারদিক সুনসান হয়ে গেল। কানে এল জলের ছলাত-ছলাত শব্দ। ভিটু ভুলেই গিয়েছিল যে, বঙ্গোপসাগরের জোয়ার-ভাটা নদীমুখ দিয়ে ঢুকে, ৫০ কিলোমিটারেরও বেশি দূরে পর্যন্ত জল ঠেলে দেয়। দিনে দুটো জোয়ার আর দুটো ভাটা হবেই। ১৬-১৭ বছর আগে একবার এত বড় ঢেউ এসেছিল যে, গড়ের মাঠে আধ-মানুষ জল দাঁড়িয়েছিল। চৌরঙ্গিতে নাকি লোকে বড়-বড় জ্যান্ত ইলিশ ধরেছিল ! ভিটুর মনে পড়ল তাকেই ইংরেজিতে 'বোর টাইড' বলে। সোজা বে অব বেঙ্গল থেকে আসে। ওদের ভূগোল বইতে আছে। যাকে চোখে দেখা যায়, মনে দেখা যায়, হাতে না ছুঁলেও, নাগাল না পেলেও, তাকে আঁচ করা যায় ; তাকে কাগজে না নামালেও, মনে-মনে স্পষ্ট দেখা যায়। আর যদি কাগজ, ক্রেয়ন, ফেল্ট-পেন হাতে পাওয়া যায়, তবু দেওয়ালের ছবিটা কিছুতেই মনের মতো হয় না।

নৌকো থেকে জিনিস নামানোর কাজ শুরু হয়ে গিয়েছিল। ছালা, বস্তা, দড়ির গোছা, কাঠের গাঁটরি। যে দিকটাতে ভিটু বসেছিল, সেটা হল গিয়ে ওদের ঘরকন্নার দিক। রাঁধাবাড়া, ভাঁড়ার, চান-খাওয়া, শোওয়া, ছবি-আঁকা, গান-গাওয়া, গল্প-গুজবের দিক। অন্য দিকটা হল গিয়ে কাজকর্মের দিক, টাকা রোজগারের দিক। জলের ওপর দুই দিক দিব্যি সুন্দর এক ঠাঁই হয়। এত কথা কোনওদিন মনে হয়নি ভিটুর, কী আশ্চর্য !

ছোড়দা কবে কী বানিয়ে গল্প বলেছিল, তাই নিয়েই যত রাজ্যের জল্পনা-কল্পনা ! একটা মা-বাপ পাওয়াই কত ভাগ্যির কথা, আবার দু-দুটো নিয়ে চিন্তা-ভাবনা। ওদিকে ওই পাঁচটা ছেলের কথা ভাব ! নিজেরাই যে কে, কোথায় বাড়ি, কেমন করে এমন দশা হল, কিছুই মনে নেই। মনে আছে শুধু একটা ভয় ! মারের ভয়, ব্যথার ভয়, অন্ধকারের ভয় ! যদি কেউ কোনওদিনও ওদের ভালবেসে থাকে, তাকে ওরা কবে, কীভাবে হারিয়েছে, তা পর্যন্ত মনে নেই। এমনই

রামাধীন

আশিস সান্যাল

নাম তার রামাধীন,
করো যদি ঠাট্টা
চরকির মতো পাক
দেয় গোটা মাঠটা।

গ্রীষ্মের গরমেতে
স্নান করে নিত্য,
কেট্‌লির ফোটা জলে—
ঝরঝরে চিত্ত।

শীতকালে হাতে নিয়ে
ছাতা এক মস্ত
ঘুরে আসে কলকাতা
ট্রামে উদয়াস্ত।

বর্ষার রাতে তার
হয় বুঝি জ্বর রে,
আরামেতে শুতে তাই
যায় হিম-ঘর রে।

এইসব নিয়ে যদি
করো কেউ ঠাট্টা,
মস্তকে মেরে দেবে
গোটা চার গাঁট্টা।

ছবি : কৃষ্ণেন্দু চাকী

অভাগা যে অঙ্কে ভুল করার জন্য তাড়া দেওয়ার পর্যন্ত কেউ নেই। অঙ্কই কষতে হয়নি ওদের। লক্ষ্মীছাড়া আবার কাকে বলে ?

হঠাৎ চমকে খেয়াল হল, এত সব তত্ত্বকথা ভাবতে-ভাবতে নিজেরই অজান্তে নতুন বাঁশের চোঙটার আগাগোড়া ভিটু নকশা কেটে ফেলেছে। নীচে একটা সুড়ঙ্গমতো, তাতে জল ঢুকেছে, জলে কুমির আর তলোয়ার-মাছ। জল থেকে চোঙ ঘিরে পাকে-পাকে সিঁড়ি উঠেছে। তার নীচের দিকের দেওয়ালে কাঁকড়া বিছে, মাকড়সা। কিন্তু যতই ওপরে ওঠা যায় ততই আলো, দেখা যায়। হাড়-জিরজিরে কালো-কালো শরীর, বড়-বড় চোখ, একটার হাত ধরে আর-একটা ছেলে সিঁড়ি বেয়ে উঠছে। আর সবার ওপরে মস্ত এক মশাল হাতে, চারদিকে তার আলো ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে লম্বা-চওড়া সুন্দর একজন মানুষ, কিংবা দেবদূতও হতে পারে। তার মুখটা কেমন চেনা-চেনা লাগছে।

ততক্ষণে অনেক বেলা হয়ে গেছে। আজ অন্য মাঝিদের নৌকোতে রান্না হচ্ছে তাই জিনিস নৌকোর এ দিকটা চুপচাপ। ভিটু ছইয়ের ভেতর সরে বসে, মন দিয়ে মাঝিদের দেনা-পাওনার হিসেব মেলাতে লাগল। মামু ঠিক যেভাবে বলে গিয়েছিলেন। কষতে বললেই মাটিং চকার হয়ে যেত। দুটো তালিকা মিলিয়ে দেখা, ব্যস, আর কিছু নয়। বাঁচা গেল কিন্তু করতে গিয়ে দ্যাখে, খুব মন দিয়ে কাজ করতে হবে।

হঠাৎ একটা চেনা গলা কানে এল। মিঃ চ্যাউড্রি বাড়ির অন্য বাসিন্দাদের সঙ্গে সম্পর্ক না রাখলেও, নিজেদের বাড়িতে, বোধ হয় নিজেদের কর্মচারীদের সঙ্গে প্রায় রোজই রাগারাগি বকাবকি করেন। তাই তাঁর গলা শুধু ও-বাড়ির সকলেই নয়, ওই পাড়ার সবাই চেনে। ভিটু বুঝতে পারল উনি মামুর নৌকো তল্লাশি করতে চাইছেন আর গুদোমের ফোরম্যান আপত্তি করছেন। খুব খারাপ-খারাপ কথা বলছেন চ্যাউড্রি আর ষণ্ডাগুণ্ডা ফোরম্যান বলছেন, "বেশি চ্যাঁচামেচি করে কাজের ব্যাঘাত করলে ঠ্যাং ধরে জলে ফেলে দেব ব্যাটা তোকে !"

এমন সময় নদী-পুলিশের একটা মোটরবোট এসে পাশে লাগল। আর-একজন কুচকুচে কালো ষণ্ডাগুণ্ডা পুলিশ সায়েব, পকেট থেকে নোটবই বের করে চোস্ত ইংরেজিতে বললেন, "নাউ ! নাউ ! এগিয়ে যান, এগিয়ে যান। কারও ন্যায্য কাজে বাধা দেবেন না। এঁরা কারও অসুবিধা করছেন না। পুলিশ পারমিট নিয়ে জিনিস খালাস করছেন।"

পুলিশ দেখে চুপসে গেল চ্যাউড্রি। পিন-ফোটানো বেলুনের মতো হয়ে গেল। নকল হাসি হেসে বললেন, "আসলে, গাড়িটার জন্য পেট্রল পাব কি না জানতে এসেছিলাম। তেলটা একটু কম আছে।"

পুলিশ ভুরু কুঁচকে বললেন, "বেআইনি তেল ? মালবাহী নৌকোয় তেল পাওয়া যায় ? কী বলেন, মিস্টার ফোরম্যান ?"

ফোরম্যান কাষ্ঠ হেসে বললেন, "সার্চ করে দেখতে পারেন।" ব্যাপারটা ওইখানেই চুকে গেল। চ্যাউড্রি ব্যস্ত হয়ে বললেন, "সরি, ইনস্পেক্টর। তেল খুঁজে-খুঁজে হয়রান হয়ে, বুদ্ধিশুদ্ধি গুলিয়ে গেছে। নো ব্যাড ফিলিংস !"

এই বলে হন্তদন্ত হয়ে গাড়ি চেপে রওনা দিলেন। ইনস্পেক্টর ডেকে বললেন, "সামনের মোড়েই পেট্রল পাম্প আছে। কোনও অসুবিধে হবে না।"

সমস্ত ব্যাপার দেখে ভিটু তাজ্জব বনে গেল। চলে যাওয়ার আগে ইনস্পেক্টর বললেন, "ওঁকে বললেই পারতেন আপনাদের পারমিট আছে।"

ফোরম্যান বললেন, "মন্দ লোকেদের সঙ্গে আমি কথা বলি না।" ইনস্পেক্টর হেসে চলে গেলেন আর ভিটু আশ্চর্য হয়ে ভাবতে লাগল এই যদি কথা না বলার নমুনা হয়, তা হলে কথা বললে বোধ হয় জলে আগুন ধরে যাবে।

ফোরম্যানের অনুমতি নিয়ে, যারা এবেলায় শেষ বোঝা পিঠে তুলে ওপরে গেল, তাদের হাতে ভিটু একটা চিরকুট পাঠাল। তাতে খালি লিখল, "অল ক্লিয়ার!" জানত মামু যেমন বুদ্ধিমান, অমনি বুঝে নেবেন যে সুড়ঙ্গ অনুসন্ধানের সময় এসেছে।

যা ভেবেছিল ঠিক তাই। চোঙ চাঁচাছোলা হয়ে গেলে, জায়গাটা সাফসুতরো করে রেখে, সবে মাত্র সকাল থেকে ভিজিয়ে রাখা কড়া চায়ের পাতা ছেঁকে, সেই কড়া সুগন্ধি জলে চোঙটি চুবিয়ে হাত ধুয়ে বসেছে। তখন সন্ধ্যা হয়-হয়, এমন সময় একেবারে চাওয়ালাকে সঙ্গে করে, হাতে গরম কচুরির ঠোঙা নিয়ে আর পেছনে ল্যাংবোটের মতো ছেলে পাঁচটাসহ হাসি-হাসি মুখ করে মামু এসে উপস্থিত।

সবাই মিলে চা-কচুরি খাওয়া হল। খুদেগুলো সারাদিন গোছগাছ ফরমায়েশ খেটেছে। এখন বলছে ওরা লেখাপড়া শেখার সঙ্গে ছুতোর-মিস্ত্রির কাজও শিখবে। র‍্যাঁদা চালানো যে এত মজার ব্যাপার ওদের ধারণাই ছিল না। আঁধার নামার আগেই সবাই গা ধুয়ে ক্লান্ত শরীরে ধুপধাপ ছইয়ের নীচে শুয়ে পড়ল। ছোট নৌকোতে মাঝিরা ডাল-ভাত, মাছ-চচ্চড়ি রাঁধছে। মামু এসে ভিটুর পাশে বসে বললেন, "খুলে বাতলা।"

যা-যা হয়েছিল শুনে আরও বললেন, "এরা যখন কাজে ব্যস্ত ছিল, আমি আমার বাছাই করা বেপরোয়া জনাচারেক গ্রামের অভিজ্ঞ লোক নিয়ে ওপরে-ওপরে খানাতল্লাশি করে এলাম। তুই যা সন্দেহ করেছিস, ঠিক তাই। যেখানে ধস নেমেছে, সেখানে বড়-বড় পাথরের চাঁই অনেকদিন থেকেই পড়ে আছে। ওগুলো পাড়ির অংশ। ওখানে অনেক তেঁতুলগাছও গজিয়েছে। ঝপ করে চোখে পড়ে না যে মাটির চাংড়া আর পাথরের চাঁইয়ের মধ্যিখান দিয়ে সরু খাঁড়িও আছে। শুকনো খাঁড়ি। নালা নয়। কিন্তু কাদা আর অন্ধকার। খাঁড়ি গিয়ে একটা সুড়ঙ্গে ঢুকেছে। আর সুড়ঙ্গটা ক্রমে ঢালু হয়ে উঠে গেছে। ঘুটঘুটে, অন্ধকার। জানান দিতে চাইনি বলে ভেতরেও ঢুকিনি আর সাড়াশব্দও দিইনি। রাতে আমার শিখিত-পড়িত দল নিয়ে রীতিমত তদন্ত করব।"

ভিটু ব্যাকুলভাবে বলল, "মামু, তুমি তো আর দুষ্কর্ম করতে যাচ্ছ না, দুষ্কৃতী ধরতে যাচ্ছ। হয়তো তাদের হতভাগ্য নির্দোষ ভিকটিমদের উদ্ধার করতে যাচ্ছ। পুলিশের সাহায্য নিলে ভাল হত না?"

মামু এমন করে ওর দিকে তাকিয়ে রইলেন যে, ও স্থান-কাল ভুলে তাঁর হাত চেপে ধরে বলল, "ওরা যদি দলে ভারী হয়? যদি সাড়া পেয়েই সুড়ঙ্গে বোমা ফেলে দেয়?"

মামু ওর পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললেন, "দূর ব্যাটা, সুড়ঙ্গে বোমা ফেললে ওরা নিজেরাও যে উড়নচাকি হয়ে যাবে। ভাবিস না রে। দুঃসাহসিক কাজে হাত দিলে আঁটসাট বেঁধে নামতে হয়। আর কিছুটা বেপরোয়া হতেও হয়, আবার দরকার হলে চম্পট দিতেও হয়। মরে গেলে আর তো লড়বার সুযোগ পাবিনে, বাপ! যতটা সম্ভব নিজের পৈত্রিক প্রাণটি বাঁচিয়ে চলবি। কিছু বলবি নাকি?"

ভিটু মামুর হাত চেপে ধরে বলল, "আমাকেও নিয়ে চলো, মামু। হাতেনাতে কাজ শিখবার এমন সুযোগ আবার কবে পাব?"

মামু মহা অপ্রস্তুত। "ওরে, অমন কথা মনেও ঠাঁই দিসনে। যদি কিছু হয়, তা হলে তোর বাবার কাছে মুখ দেখাব কী করে?"

ভিটু খুব হাসল। "কী যে বলো, মামু। আমার কিছু হলে, তুমিই কি আর জ্যান্ত ফিরে আসবে ভেবেছ? চলো, দুজনেই যাই। কী দেখব গিয়ে বলে দেব তোমাকে? দেখব একটা গুহাঘর। টিমটিম করেও হয়তো কোথাও একটু আলো জ্বলছে না। পাছে সুড়ঙ্গের বাইরে থেকে জানান দেয়। টর্চ ফেলে দেখব দেওয়ালে আংটার সঙ্গে শেকল-বাঁধা হাড্ডিসার কয়েকটা ছেলেমেয়ে। ক'টা প্যাকিং-বাক্স। ক'টা ঘুমন্ত পাহারাওয়ালা।"

সোনামুখে সোনা হাসি ঝরলে — স্ন্যাপার

মিষ্টি মিঠু মিষ্টি হাসি দিলে — স্ন্যাপার

স্ন্যাপার — মধুর কিছু ধরে রাখতে হলে

বিপণনে : আগফা গেভার্ট ইণ্ডিয়া লিমিটেড

ULKA 13145-BEN

॥ ৭ ॥

সে একটা ব্যাপার বটে। উত্তেজনার চোটে রাতে কিছু খেতেই পারল না ভিটু। মামুও বললেন কাজে বেরোবার আগে তিনি জল স্পর্শ করেন না। তবে দু'জনেই জলের বোতল ভরা জল আর মামু তাঁর কাঁধে ঝোলানো ব্যাগে কিছু ওষুধপত্র নিলেন। ভিটুর মুখ দেখে বললেন, "হাসি পাচ্ছে বুঝি ? জানিস আমি পাশ-করা ডাক্তার ? জ্ঞান বেশি হলে মাথা বিগড়ে যায়। আমাকে দেখে শেখ।" মনে হল, কেমন একটা স্ফূর্তিতে পেয়েছে মামুকে। ভিটুর নিজেরও মনে অন্তত একটা ভয়-ভয়, স্ফূর্তি-স্ফূর্তি ভাব জাগছিল।

মামু বলে দিয়েছিলেন, "যা বলবার বা জানবার, এখনই হয়ে যাক। একবার নৌকোতে উঠলে আর রা কাড়বিনে। কেউ জিজ্ঞেস করলে বলবি কাঁকড়া শিকারে যাচ্ছি। নিজেরা একদম বোবা বনে থাকবি।"

ভিটু ভেবেছিল ওইটুকু পথ ওরা বুঝি হেঁটেই যাবে। দুজনের পায়ে রবারের জুতো, এতটুকু শব্দ হয় না। মামু বললেন, "পথে যারা বেরোয় তাদের ওপর সকলের চোখ পড়ে। এই মেছো নদীতে সবাই একরকম অদৃশ্য থাকে। কেউ কারও ধার ধারে না। খাঁড়ির মুখ ছাড়িয়ে বটতলায় নামব। সেখানে লোক থাকবে আমাদের অপেক্ষায়। তারা এই ধরনের লড়াইতে শিখিত-পড়িত। যে-কোনও পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে পিছপাও হয় না। তুমি বোবা বনে থাকবে। ওরা কিছু জিজ্ঞেস করলে তবে উত্তর দেবে।"

ভারী ভাল লাগছিল ভিটুর। কাশীর দাদু বর্মায় যুদ্ধ করে হাঁটা পথে দেশে ফিরেছিলেন। তিনি বলেন, বিপদের সময় মানুষের মনে যেমন ভয় হয়, তার সমান একটা সাহসও জাগে। সেইরকম হচ্ছিল ভিটুর মনে। নৌকোর ছইয়ের তলায় বসে মামু ওকে ভীষণ ভাল কমলা ল্যাবেঞ্চুস খেতে দিয়েছিলেন। কথা বলেননি। একটু হেসেছিলেন শুধু। দেখতে পায়নি ভিটু, তবু টের পেয়েছিল। মামু বড় ভাল।

আধ ঘণ্টার মধ্যে ওরা বটতলার ছায়াতে নোঙর ফেলেছিল। খাঁড়ির মুখ ছাড়িয়ে আরও ৫০ হাত এগিয়ে। মাঝিরা ওদের নামিয়ে তীরের কাছেই নৌকো বেঁধেছিল। সেখানে আরও দুটো নৌকো বাঁধা ছিল। মামু আর ভিটু নেমে ওই পথটুকু হেঁটে ফিরে, খাঁড়ির মুখে পৌঁছল।

খাঁড়ি দেখা যায় না। মাটির চাংড়ায় কাঁটা ঝোপ গজিয়েছে, পাথরটাতে বহু দিনের ছাপ। কারা বেড়াতে এসে নিজেদের নাম লিখে গেছে। পরে ভিটু দেখেছিল। ভাবে নাম লিখে কী আর নাম করা যায় ? দাদু বলেছিলেন আজ যদি একশোজন লোক নাম করে, একশো বছর পরে তার নিরানব্বই জনের নাম লোকে ভুলে যায়। কাজ দিয়ে হল কথা। নাম দিয়ে কী হয় ?"

এই সব ভাবছে, এমন সময় কালো পোশাক পরা চারজন লোক নিঃশব্দে অন্ধকারেই দুটো আলাদা টুকরো মতো মামুর সামনে এসে দাঁড়াল। শত্তুর মনে করে, একটা চিৎকার ভিটুর মুখে এসেছিল। কিন্তু মামু শব্দ করতে মানা করেছেন বলে মুখে হাত চেপে রাখল। ভাগ্যিস, চ্যাঁচায়নি। কারণ তারা মামুরই লোক। তাঁকে নিঃশব্দে স্যালুট করেই, ঘুরে দাঁড়িয়ে খাঁড়ির মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

মামু ভিটুকে টেনে নিজের সামনে এনে, ওর ঠোঁটের ওপর আঙুল রেখে মনে করিয়ে দিলেন যেন টুঁ শব্দটি না করে। তার কোনও দরকার ছিল না অবশ্য, কারণ বড় নৌকোতেই তাকে পাখি-পড়া করেছিলেন। হয়তো এক মিনিট অপেক্ষা করে মামুর সঙ্গে ভিটুও

খাঁড়িতে নামল। তারপর দু'জনে সামনের অন্ধকার সুড়ঙ্গে ঢুকল।

এবার মামু আগে গেলেন। ওকে ঠেলে পেছনে সরিয়ে। বলা ছিল সুড়ঙ্গে নিঃশব্দে চলাফেরা করতে হবে। কিন্তু যদি ভেতরে শোরগোল, গুলি ছোঁড়াছুড়ি হয়, তা হলে সটান পেছনফিরে মহা চেল্লাচিল্লি করলেও ক্ষতি নেই। তবে ও-রকম কিছু যাতে না হয়, সেইজন্যই দলের লোক রাখা হচ্ছে। ওই চারজন কালো পোশাক পরা লোক তা হলে দলের লোক। ওদের হয়তো কমান্ডো ট্রেনিং দিয়ে এনেছেন। কোথায় বা কেমন করে তা নিয়ে ভিটুর মাথা ঘামাবার কী দরকার ? মামু যে কোনও অন্যায় বা নিষ্ঠুর কাজে হাত দেবেন না, এ বিষয়ে সে নিশ্চিন্ত। তা উনি দুষ্কৃতীই হোন আর যা-ই হোন। নিষ্ঠুর কাজ যদি কেউ করে তো ওই হৌতকা চ্যাউড্রি করতে পারে। ওর মুখটাই কেমন নৃশংস মতো। ভাল লোকে ওইরকম ব্যবহার করে কখনও ? মিছিমিছি ফোরম্যানকে গালাগালি দিয়ে লোক হাসাল, নদী-পুলিশ ডাকাল ! মামু নিশ্চয় নদী-পুলিশের কুনজরে পড়তে চান না। জিনিস-বহনের ব্যবসা করে এতগুলো লোক পুষতে হয়। এমনকী, ভিটুকেও। চ্যাউড্রিটা একটা যাচ্ছেতাই ! ঠিক হয়েছে, তাড়া খেয়েছে !

হঠাৎ খেয়াল হল, সুড়ঙ্গে একটু-একটু আলো কেন ? চেয়ে দ্যাখে দু'ধারে দেওয়ালে ব্যাঙের ছাতার মতো কীসব হয়েছে, তার গা থেকে জোনাকির মতো আলো বেরোচ্ছে। মনে পড়ল একে ছত্রাক বলে। ব্যাঙেরও কিছু নয়, কারও ছাতাও নয়। আর এইগুলো ছাতার মতো দেখতেও নয়। এই সময় মামু ওকে আবার কাছে টেনে নিলেন।

'আঁক' করে একটা শব্দ হল আর হুড়মুড় করে কে বা কী যেন পড়ল ! ওইখানে সুড়ঙ্গটা হঠাৎ আর-একটু খাড়াই হয়ে, সমকোণের মতো মোড় নিয়েছে। কে একটা লোক গড়িয়ে এসে ওদের পায়ের কাছে পড়ল ! তার সঙ্গে-সঙ্গে আর-একটা। অমনই চারদিকে উজ্জ্বল আলো জ্বলে উঠল। মামুর লোকেরা তাদের টর্চের ঘেরাটোপ খুলে ফেলেছিল। চারদিক আলোয় আলো। সেই আলোতে ভিটুর চোখ ধাঁধিয়ে গেল। মনে হল সে ভুল দেখছে !

দেখল সামনে একটা বিশাল গুহা। গুহার মধ্যে চিড়িয়াখানার জানোয়ারের খাঁচার মতো খাঁচায় দশ-বারোটা নেংটি-পরা ছেলে। এমনই রোগা যে, হঠাৎ দেখলে মনে হয় কঙ্কাল ! ওদের দেখেই তারা হাতজোড় করে কাঁদতে লাগল। কান্না না গোঙানি কিছুই বোঝা যাচ্ছিল না। এই কান্নাই ওপর থেকে শুনতে পেয়েছিল ভিটুরা, সেই প্রথম দিন। পাথরের ছাদে সুতোর মতো ফাটল আছে। তাই দিয়ে মানুষ যেতে পারে না, কিন্তু তাদের বুক-ফাটা কান্না পৌঁছয়। মানুষ বড় দুঃখী।

ভিটুর বুকের মধ্যে ভীষণ একটা রাগ আগুনের মতো জ্বলতে লাগল। আবার দুঃখে তার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। মামু ততক্ষণে একজন হাতকড়া-পরা লোকের পকেট থেকে চাবির গোছা বের করে খাঁচাগুলোর তালা খুলে দিয়েছেন। তবু তাদের ভয় কাটে না। হাতজোড় করে দাঁড়িয়েই থাকে।

ভিটু আর থাকতে না পেরে, পাশের খাঁচার ছেলে দুটোর হাত ধরে বাইরে আনবার চেষ্টা করতেই ঝুপ করে মাটিতে শুয়ে পড়ল তারা।

ততক্ষণে আরও অনেক লোকজন, ডাক্তার, নার্স, পুলিশের লোক এসে পড়েছে। ওরা কখন সবাই নীচে নেমে এসেছে, ভিটু তা খেয়ালই করেনি। নীচে অনেক গাড়ি, ট্রাক। সেই চারজন পাহারাদারকে কোলপাঁজা করে কালো ভ্যানে তুলে দেওয়া হয়েছে। আধো অন্ধকারে কাউকে আর ভিটু চিনতে পারছিল না। খালি বলছিল, "এমন হওয়া উচিত না। এমন হতে দেওয়া উচিত না।

এক বৎসর

২৬ সংখ্যার জন্য ১৮২ টাকার বদলে
এখন দিতে হবে মাত্র ১৫৫ টাকা

দুই বৎসর

৫২ সংখ্যার জন্য ৩৬৪ টাকার বদলে
এখন দিতে হবে মাত্র ৩০০ টাকা

বিদেশের গ্রাহক

বার্ষিক ২৬ সংখ্যার জন্য
৩৬ ডলার অথবা ২২ পাউন্ড

আপনি যদি গ্রাহক হতে চান তাহলে অনুগ্রহ করে আপনার নাম ও সম্পূর্ণ ঠিকানা অবিলম্বে আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেডের অনুকূলে চেক অথবা ড্রাফট সহ নীচের ঠিকানায় পাঠান :

সারকুলেশন ম্যানেজার (ইউ)
আনন্দ বাজার পত্রিকা লিঃ
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট কলিকাতা-৭০০ ০০১

কলিকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে প্রযোজ্য নয়

CLARION C-ABAMD-1

এমন হয়, তবু লোকে খায়দায়, সাজেগোজে, স্ফূর্তি করে ! তাদের চাইতে মামুর মতো দুষ্কৃতীরা ঢের-ঢের ভাল ! আমি ভাল লোক হতে চাই না ! মামুর মতো দুষ্কৃতী হব। তারা ঢের ভাল, ঢের ভাল !"

ততক্ষণে কে যেন ওকে শক্ত করে ধরে বাইরে নিয়ে এসেছে। রাতের অন্ধকার পাতলা হয়ে এসেছে। সেই ফিকে আলোতে ভিটু দেখল, সামনে দুটো অ্যাম্বুলেন্স দাঁড়িয়ে আছে আর সেই রোগা ছেলেগুলোকে যত্ন করে তাতে তোলা হচ্ছে। চারদিকে অনেক গাড়ি, অনেক লোক। পুলিশের ভ্যান দুটো চলে গিয়েছিল ততক্ষণে ওই চারটেকে নিয়ে।

কে যেন বলল, "যাক, সব ভাল যার শেষ ভাল। আশা করা যায় ওদিকেও এতক্ষণে আসল অপরাধী যে কিংপিন, তাঁরও হাতে হাতকড়া পড়ে গেছে !"

তাই শুনে ভিটুর সে কী স্ফূর্তি ! সে কিংপিন যে মামু নন, তা হলে এরা তা অ্যাদ্দিনে টের পেয়েছে। আঃ, বাঁচা গেল। কিংপিন তা হলে কালো অ্যাম্বাসাডরের মালিক ওই অভদ্র চ্যাউড্রি, যাকে ও সর্বদা সন্দেহ করে ! এবার বাবা পথে এসো !

ঠিক এই সময় টপ করে সূর্যটা উঠে পড়ল আর বিশ্বাস করো, না-ই করো, মুহূর্তের মধ্যে চারদিক আলো হয়ে গেল। হয়তো অনেকক্ষণ ধরেই ওঠবার জন্য হাঁকুপাঁকু করছিল, খালি সামনে মেঘের পরদা থাকাতে মালুম দেয়নি। সেই ভোরের সাদা আলোতে একটা কালো অ্যাম্বাসাডর এসে ওদের সামনে থামল। আর দেখল ভিটুর চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসছিল, তার মধ্যে থেকে দু'জন লোক নামলেন। আগের জন হলেন দিব্যি বহাল তবিয়তে এবং ছাড়ন্ত অবস্থায় ভোঁদা চ্যাউড্রি আর বিশ্বাস করো বা নাই করো, অন্যজন স্বয়ং বাবা !

তখন নিজেকেসুদ্ধু অবাক করে দিয়ে, কাণ্ডজ্ঞান ভুলে গিয়ে, "বাবা ! বাবা ! বাবা !" বলে যে তাকে এতক্ষণ ধরে রেখেছিল, তার হাত ছাড়িয়ে এক দৌড়ে ১২ বছরের ওই ধেড়ে ছেলে খচমচ করে বাবার কোলে উঠে পড়ে বাবার গলায় মুখ গুঁজল। বাবা পড়ে যান আর কি ! ভাগ্যিস, ভোঁদা ঠেকো দিলেন !

ভিটু টের পেল ওই অবস্থাতেও বাবার ৬ ফুট শরীরটাকে সাপোর্ট দিয়েও, চ্যাউড্রির পেটের ভেতর থেকে হাসির দমক উঠে আসছে ! তিনি বললেন, "ওরে নটে, অমন করিসনে, আমি যে তোর ছেলের ঘোর সন্দেহের পাত্র !" ভিটু তো হাঁ ! কী আস্পর্ধা, বাবাকে তুই-তোকারি করছে ! তারপর ভোঁদা কাকে যেন বললেন, "তা হলে, আমার আঁচটাই ঠিক হল ? কিংপিন যখন ফাঁদে পড়েছে, সমস্ত ব্যবসাটাই তখন ফেঁসে গেল ? একটা পাপ ঘুচল ?"

তার উত্তরে মামুর গলা শুনতে পেয়ে বাবার গলা থেকে মুখ তুলে চেয়ে রইল। মামু বললেন, "হ্যাঁ সার। অপারেশন সাকসেসফুল ! ভাবতে পারো দুষ্কৃতী মামু একজন গুপ্ত গোয়েন্দা আর ভোঁদা চ্যাউড্রি তাঁর ওপরওয়ালা !

বাবার গলা ছেড়ে নেমে পড়ে ভিটু বলল, "আমিও তা হলে গুপ্ত গোয়েন্দা হব, বাবা। ছোড়দাও হবে।" ভোঁদা বললেন, "তা হলে আমাদের পায় কে ! দেশ থেকে দুষ্কর্ম উঠে যাবে। একগাদা লোক বেকার হবে।

বাবার গা থেকে নেমে পড়লেও, কনুইয়ের কাছটা ভিটু ধরেছিল। এবার কনুইটাতে একটু নাড়া দিয়ে বলল, "সবাই যদি পুলিশের লোক হয়, তা হলে ছেলেধরা আর চোরাচালানকারী কারা ? জাপুদাদের কারা ধরেছিল, আর এই ছেলেদেরই-বা কারা ধরেছে ?"

ভৌদা বললেন, "আমাদের বাড়ি চলো সবাই। কচুরি-জিলিপি দিয়ে ব্রেক ফাস্ট আর রহস্যজাল ছিন্ন করা একসঙ্গে হবে। বাড়ির সবাইও নিশ্চিন্ত হবে।"

॥ ৮ ॥

শুনে সবাই মহাখুশি। মনের ওপর থেকে যেন সকলেরই একটা বড় বোঝা নেমে গিয়েছিল। সব্বাই যত রাজ্যের বাজে বকছিল। বড়রা বাজে বকলে শুনতে বেশ মজা লাগে। ভৌদা চ্যাউড্রি বাংলায় বাজে বকছেন, ভেবেও ভিটু থ! ও কতবার নিজের কানে শুনেছে উনি বাড়ির লোকদের পর্যন্ত ইংরেজিতে গাল দিচ্ছেন, অবশ্য খুব খারাপ কথা হয়তো বলতেন না, কিন্তু নিউন্যান্স, বাফুন, ড্যামফুল, এইসব হামেশাই বলতেন। বিশেষ করে ওঁর গাড়ি চালায় যে, ওই জ্যাকিকে। সে উলটে কিছু বলে হয়তো। তবে বিড়বিড় করে, কেউ শুনতে পায় না।

ভৌদা বললেন, "ভিটু, আমার সঙ্গে এসো। ভাব পাকানো যাক। জ্যাকির সঙ্গে আলাপ হয়েছে? ওকে এয়ারফোর্সে নাম লেখাতে দেওয়া হয়নি বলে, রেগে আমার গাড়ি চালায়।"

ভিটু বলল, "ওকে অত বকেন কেন, কাকু?"

ভৌদা আকাশ থেকে পড়লেন, "নিজের ছেলেকে বকব না তো কাকে বকব বল? অন্যরা চাকরি ছেড়ে চলে যাবে না!"

"অ্যাঁ! ও আপনার ছেলে? কী আশ্চর্য!"

"কেন, আশ্চর্য কেন? ওর ওই সুন্দর চেহারা দেখে বলছিস? ভাল করে তাকিয়ে দ্যাখ। ও আমার মতো দেখতে নয়?"

ভিটু একবার ভৌদার দিকে একবার জ্যাকির দিকে চেয়ে অবাক হয়ে বলল, "সত্যি, হুবহু এক! আপনাকে এক মাস ডায়েট করালে আর ওকে দুধ-ক্ষীর-মাখন খাওয়ালে আলাদা করে চেনা যাবে না।"

ভৌদা বললেন, "ছিঃ, অমন পাকা-পাকা কথা বলতে হয় না। মনে হলেও না। আমি জিজ্ঞেস করলেও না। সত্যি হলেও না।"

জ্যাকি বিড়বিড় করে বলল, "হোয়াট রট। আমি নদী-পুলিশে চাকরি নেব। সে যে এত থ্রিলিং আমার জানা ছিল না।" এই বলে গাড়িতে স্টার্ট দিল।

ভিটু বলল, "আমিও। আর একটু মন দিয়ে পড়ে পাশটাশ করে, মামুর সঙ্গে কাজ করব। মামু যদি নেয় আমাকে।"

বাবাও ছিলেন ওই গাড়িতে। বললেন, "বোটন বলছিল ও নাকি মজা করবার জন্য তোকে বানিয়ে-বানিয়ে কী গল্প বলেছে, এই মা-বাবা, অর্থাৎ আমরা তোর নিজের মা-বাবা নই, তোকে পাহাড়ে কুড়িয়ে পেয়ে মানুষ করেছি। তাই তুই তোর সত্যিকার মা-বাপকে খুঁজতে গিয়েছিলি?"

ভিটু বলল, "ও-সব পরিদের গল্প আর আমি বিশ্বাস করি না। সুড়ঙ্গে ঢুকে আমার চোখ খুলে গেছে।" এর মধ্যে আরও দু'খানা গাড়ি করে বাকি সকলে ভিটুদের বাড়ি পৌঁছে গেছে। কিন্তু দোতলায় না উঠে একতলায় টি চ্যাউড্রির ফ্ল্যাটে ঢুকেছে। ভাল কথা, টি হল তপনকুমার আর জ্যাকি হল জীবনকুমার। মামু আসেননি। তাঁর নাকি ডিউটি আছে।

নীচের ফ্ল্যাটে ঢুকবার আগে ভিটু ওপরে নিজেদের ফ্ল্যাটের দিকে তাকিয়ে হেসে হাত নাড়ল। মা, মাসি, বড়দা, ছোড়দা, ছোটকাকু,

আকাশে ওড়ার কথা □ আটত্রিশ — ধ্রুবজ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯২৬ : বিমানে মেরু বিজয়

আমুণ্ডসেনের আকাশ-জাহাজ নর্জ

বিমানে উত্তর ও দক্ষিণ মেরু অভিযান করেন এক মার্কিন বৈজ্ঞানিক অ্যাডমিরাল আর· ই· বার্ড। তাঁর দুটি অভিযানই ছিল বিপদসঙ্কুল। উত্তর মেরু অভিযান শুরু হয় ৯ মে ১৯২৬, এতে বার্ড ছিলেন পথ-নির্দেশক আর বৈমানিক ছিলেন ফ্লয়েড বেনেট। বিমানটি ছিল তিন এঞ্জিন-যুক্ত ফকার এফ-৭, যার নাম দেওয়া হয়েছিল জোসেফিন ফোর্ড। উত্তর মেরু অভিযানে জোর প্রতিযোগিতা হয়েছিল একদিকে বার্ড ও বেনেট আর অন্যদিকে নরওয়েজীয় অভিযাত্রী আমুণ্ডসেনের মধ্যে। আমুণ্ডসেন যাত্রা করেছিলেন ইতালীয় জেনারেল উমবার্তো নোবিলের তৈরি আকাশ-জাহাজ বা এয়ারশিপ নর্জ-এ। দু' দলই জড়ো হলেন স্পিৎসবার্জেন শহরে, আর শুরু হল এই বিপদসঙ্কুল অভিযানের তোড়জোড়। জোসেফিন ফোর্ডে চাকার বদলে বরফে নামার উপযোগী স্কি লাগিয়ে নেওয়া হল। ৯ মে রাত একটায় জোসেফিন ফোর্ড কুড়ি ঘণ্টার মতো জ্বালানি নিয়ে আকাশে উড়ল, নর্জ তখনও মাটিতে। ধু-ধু সাদা বরফের ওপর দিয়ে বিমান চলল ৮০০ মাইল দূরে উত্তর মেরুর দিকে। হঠাৎ একটি জ্বালানি ট্যাঙ্কে ছিদ্র ধরা পড়ল, ওঁরা বরফের ওপর নেমে ছিদ্র সারিয়ে নেওয়ার বদলে উড়ে চললেন বিপদ মাথায় নিয়ে। প্রায় আট ঘণ্টা একটানা ওড়ার পর ওঁরা উত্তর মেরুর ওপরে এসে গেলেন ও আমেরিকার জাতীয় পতাকা বরফের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে ফিরে চললেন স্পিৎসবার্জেনের দিকে।

১১ মে আমুণ্ডসেন রওনা হলেন উত্তর মেরু অভিযানে। নর্জে ছিলেন তিনি ছাড়া বৈমানিক জেনারেল নোবিল ও ষোলোজন কর্মী। উত্তর মেরু অবধি নির্বিঘ্নে যাওয়ার পর ওঁরা চললেন অনাবিষ্কৃত অঞ্চলের ওপর দিয়ে, নতুনের অভিযানে। তখনই শুরু হল বিপদ। প্রথমে রেডিও গেল বিগড়ে, আর বরফের টুকরোয় আকাশ-জাহাজের গায়ে ছিদ্র হয়ে গ্যাস বেরিয়ে যেতে থাকে। এ ছাড়া ঘন কুয়াশায় চারদিকে কিছুই দেখা যায় না। এইভাবে আরও দশ ঘণ্টা ওড়ার পর প্রায় তিনদিন তিনরাত্রি পরে নর্জ অবশেষে ৩,৫০০ মাইল পাড়ি দিয়ে আলাস্কায় নিরাপদে অবতরণ করে।

বার্ড এর পর দক্ষিণ মেরু বিজয়ের প্রস্তুতি শুরু করেন। চারটি বিমান ও চারজন বৈমানিক মেরু থেকে ৪০০ মাইল দূরে বে অব হোয়েল্‌সে আস্তানা করে তৈরি হতে থাকেন। এক সার্ভে ফ্লাইটের সময়ে আকস্মিক মেরুঝড়ে একটি বিমান খেলনার মতো উড়ে যায়, দুই বৈমানিক অবশ্য অক্ষত থেকে যান ও নির্জন অ্যান্টার্কটিক অঞ্চলে নিদারুণ কষ্টে টিকে থাকেন।

বড়কাকু, সবাই জোরে-জোরে হাত নাড়তে লাগল। কিন্তু সেনগুপ্তদের বাড়ির কাউকে দেখল না।

টি চ্যাউড্রির ফ্ল্যাটে ভিটু কখনও ঢোকেনি, খালি তর্কাতর্কি শুনেছে আর দোতলার রান্না ঘরের জানলার জালের ফাঁক দিয়ে নাক গলিয়ে একতলার বাবুর্চিখানার খোসবাই ও আর ছোড়দা প্রাণভরে শুঁকেছে। পণ্ডিতমশাই বলেন গন্ধ শুঁকলেই আধা খাওয়া হয়ে যায় ; কিন্তু সেই আধাতে মোটেই খিদে মেটে না, বরং খিদে বাড়ে।

এখন দ্যাখে সদর দরজা দিয়ে ঢুকে ওপরের মতো নীচেও ঘেরা বারান্দা। তার বড় দরজা দিয়ে ঢুকে ওপরে যেখানে বসবার ঘর আর খাবার ঘর, এখানে একটাই মস্ত ঘর। তার একদিকে মস্ত কাচ-পাতা ডেস্ক, অনেকগুলো ফোন, আর সারা ঘর জুড়ে খালি সোফা আর কৌচ আর কেদারা আর ছোট-ছোট চেয়ার আর টেবিল। দেওয়ালে রঙিন ম্যাপ আর জীবজন্তুর ছবি। তা ছাড়া টি-ভি, ভি-সি-আর ইত্যাদি।

শোওয়ার ঘর, খাবার ঘর দেখা হয়নি, যদিও দেখার খুব ইচ্ছে ছিল। একজন রোগা ফরসা খুব সুন্দর দেখতে আধাবয়সী মহিলা এসেই কড়াগলায় ধমক দিয়ে ভোঁদাকে বললেন, "টি সি ! ফের গেঞ্জি না বদলে খাবার তালে আছ ! সেটি হচ্ছে না। যাও, গেঞ্জি বদলে এসো।" ভোঁদা সুড়সুড় করে বেরিয়ে গেলেন।

বাকিরা সবাই যার যেখানে ইচ্ছে বসে পড়ল। কিন্তু সেইসব প্যান্টালুন পরা ঝগড়াটে মেয়েদের দেখা গেল না। আর মামু এলেন না। জ্যাকিকেও ধমক দিয়ে জামা পালটাতে পাঠাবার তালে ছিলেন ওর মা। কিন্তু জ্যাকি বলল, "রাবিশ ! ঘামে খুব ভিটামিন থাকে তাও জানো না ?"

সুযোগ পেয়ে ভিটু বলল, "ঝগড়াটে মেয়েগুলো কই ? তারা তোমার বোন নাকি ?"

"আরে দূর, দূর ! তা হলে তো আমি বাঁচতাম। ওদের সামলাতেই মায়ের সময় কাটত। না, না, ওরা দরকার মতো গণ্ডগোল করবার জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ নিয়েছে। বন্ধ ঘরে একজন একা এমনই ঝগড়া করতে পারে যে, মনে হবে পাঁচজনে চুলোচুলি করছে। ওদের আজ ডিউটি নেই।'

"আর তোমাদের বাবুর্চি ? যার রান্নার সুগন্ধ শুঁকে আমাদের দিন বড় দুঃখে কাটে ?"

জ্যাকি উঠে বাও করে বলল, "আমিই সেই বাবুর্চি। হুকুম কিজিয়ে।"

এই সময় গরম গরম কচুরি, আলুর দম, জিলিপি নিয়ে মা, ছোটকাকি, বড়কাকি, মাসি, কাকুরা আর রোগা লম্বা হলদেটে গায়ের রং একজন বুড়োমতো ভদ্রলোক ঢুকলেন। টি সি আর মিসেস টি সিও চকোলেটের বড়-বড় প্যাকেট নিয়ে ঢুকে ভিটুর হাতে দিয়ে বললেন, "সকলে ভাগ করে খাও। হলপ করে বলছি, এর একটাও সৎভাবে বাজারে কেনা যায় না।"

ভিটু তাঁদের ধন্যবাদটাদ দিয়ে বলল, "এক্ষুনি আসছি।" এবং দশ মিনিট বাদে বড়দা, মেজদা, ছোড়দাকে সঙ্গে করে আবার ফিরে এল। ছোড়দার মুখটা একটু লাল দেখাচ্ছিল। তা ভিটুর মুখ তো হলদে। ওই বুড়ো লোকটির মতো। তিনি নাকি আবার মায়ের নিজের মামা। যাঁকে সবাই কাশীর দাদু বলেন। বেনারসে থাকেন। উড়ে এসেছেন ভিটু পালিয়েছে শুনে। মামাবাড়ির অনেকের নাকি ওইরকম চিনে-চেহারা, তার আর কী করা যাবে ?

সবাই এসেছিল। আসেননি শুধু তিনতলার কেউ। অথচ সেনগুপ্ত-কাকা বড়কাকুর কলেজের অধ্যাপক। তার ওপর ওঁদের সঙ্গে এত যাওয়া-আসা। জিজ্ঞেস না করে পারল না ভিটু। বাবা বললেন, "সে অনেক ব্যাপার।"

ভোঁদা-জ্যাঠা বললেন, "তোমাদের সামনেই বলেছিল না মেজর আহমেদ, 'অপারেশন সাকসেসফুল', তার মানেই হল বিপদ আসন্ন

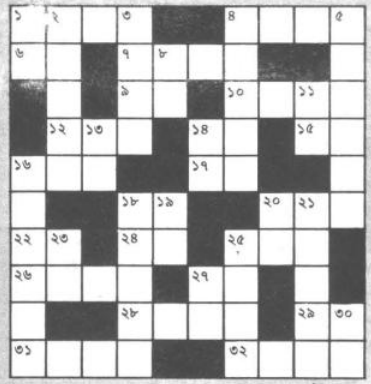

সঙ্কেত : পাশাপাশি : (১) 'ধনধান্য পুষ্পভরা আমাদের এই —'। (৪) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিধ্বস্ত শহর। (৬) প্রাপ্তব্য অনুভূতি। (৭) বিচারকের পেশা। (৯) কোন দিক ওলটালে দেহ ? (১০) শিহরন। (১২) এখানে বাস সুখের নয়। (১৪) তুল্য, সদৃশ। (১৫) মূল্যবান। (১৬) সাপ। (১৭) গরম। (১৮) হাতি। (২০) ব্যাঙ। (২২) প্রণাম, নমন। (২৪) কানের কোমল অংশ। (২৫) ভগীরথের প্রপিতামহ। (২৬) শরৎচন্দ্রের স্মৃতিবিজড়িত গ্রাম। (২৭) সপ্তাহে সাতটি। (২৮) বর্জন। (২৯) চলন, গমন। (৩১) করাত। (৩২) কোমল বস্ত্রবিশেষ।

উপর-নীচ : (১) সত্যই, প্রকৃতই। (২) বীণাজাতীয় বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। (৩) রানাপ্রতাপ যা ছিলেন। (৪) না খুব ঠাণ্ডা, না খুব গরম। (৫) অনেক পাখির সম্মিলিত ডাক। (৮) লজ্জায় কেউ-কেউ কাটে। (১১) জল ও মাটির মিশ্রণ। (১৩) পৃথিবী। (১৪) মধু। (১৬) মালি। (১৮) পতঙ্গভুক উদ্ভিদ। (১৯) প্রণালী, প্রথা। (২০) চিহ্ন। (২১) দুর্গম, দুর্জেয়। (২৩) এক সম্মানিত সর্বনাম। (২৫) চলতি কথায় স্বরগ্রাম। (২৭) হাওয়া। (৩০) শস্যবিশেষ, মানুষের শরীরেও থাকে।

গত সংখ্যার সমাধান

ফু	জি	য়া	মা	■	সা	হে	ব	বি	বি
ৎ	■	■	লি	টা	র	■	হি	■	শ্রা
কা	চ	পো	কা	■	মে	রু	■	■	ম
র	■	র	■	হে	য়	■	অ	মু	ক
■	■	ব	ল্ল	ম	■	■	রু	দ্রা	ক্ষ
আ	ক	ন্দ	■	■	ব	রু	ণা	■	■
কা	ত	র	■	ক	লি	■	চ	■	ঝা
শ	■	■	শে	র	■	কা	ল	বে	লা
যা	■	শো	■	ত	র	ফ	■	■	পা
ন	গ	র	পা	ল	■	কা	র	বা	লা

সন্দেহে পাখি উড়ে গিয়ে সটান বেড়াজালে ধরা পড়েছে। জানো তো ভয়ে পালিয়ে যাওয়া আর দোষ স্বীকার করা একই কথা ! আমাদের সার্চপার্টি হাতেনাতে সব ষড়যন্ত্রের প্রমাণ পেয়ে গেছে এ-খবর পেয়েই, তোমাদের সেনগুপ্ত-কাকাকে, তাঁর স্ত্রীকে আর মেয়েকে গোসলখানায় তালাবন্ধ করে, তাঁদের পেয়ারের কুটুম্বরা টাকাকড়ি সোনাদানা নিয়ে নতুন মারুতি ভ্যানে পালাতে গিয়ে একেবারে বাঘের বাসায় মুণ্ডু ঢুকিয়ে ফেললেন !

ভিটু আঁতকে উঠল, "অ্যাঁ ? ও হো বুঝেছি ! বাঘের বাসা হল গিয়ে তোমাদের সেই বেড়াজাল। আর তোমাদের প্রমাণ এবং সাক্ষীসাবুদ এই গুহাঘরের ছেলেগুলো আর, প্যাকিংকেস্ বোঝাই বেআইনি দ্রব্যাদি।"

এইভাবে অনেক প্রশ্নের একসঙ্গে জবাব পাওয়া গিয়েছিল ; অনেক সমস্যা মিটে গিয়েছিল।

তিন তলার সেনগুপ্তর দূর সম্পর্কে দুই মামা দীর্ঘকাল দেশ-বিদেশে কাটিয়ে অনেক বেআইনি ব্যবসা ফেঁদে, রাশি-রাশি টাকা করে, শেষ বয়সটা দেশে কাটাবেন, এই বলে তিন তলার ওই ফ্ল্যাট কিনে, আলাভোলা ভাগনে অর্থাৎ আমাদের অধ্যাপক মশাইকে দানপত্র করে দিয়েছিলেন। তাঁকে বলেছিলেন, "আমরা দেশের মাটিতে দেহ রাখতে চাই বলে ফিরে এসেছি। বিদেশে বিয়ে-থা করেছিলাম, তা সে কোনওকালে চুকেবুকে গেছে। তোরা ছাড়া আমাদের কেউ নেই। সেই ভাবে উকিলমশায়ের কাছে লেখাপড়াও করা আছে।"

এই বলে জমিয়ে বসে, নিশ্চিন্ত মনে ফলাও করে বেআইনি ব্যবসা ফাঁদলেন। 'তীর্থে যাচ্ছি' বলে দু-তিন মাস অদর্শনও হয়ে যেতেন। খুব দান-ধ্যান করতেন, কেউ কিছু সন্দেহও করত না। কিন্তু লোভ বেড়ে যাওয়াতে মধ্য এশিয়াতে উটের রেসের জন্য ছোট-ছোট হতভাগ্য ছেলে ধরে পাচার করা শুরু করেই তাঁদের কাল হল। গঙ্গাসাগরের কাছে ঝড়ে পড়ে একটা ছোট দ্বীপে নৌ-পুলিশের মেজর আহমেদ নোঙর করে একটা জেলখানার মতো বাড়ি থেকে পাহারাদারসহ পাঁচটি ছেলেকে উদ্ধার করেছিলেন। নিজেদের প্রাণ বাঁচাবার আশায় পাহারাদাররা যা স্বীকার করেছিল, সেই সূত্র ধরে আহ্‌মেদ আসল অপরাধীদের চিনতে পারে। কিন্তু এতকাল তাদের আসল ঘাঁটিটি খুঁজে বের করতে হুগলি নদীকে একরকম তাড়ু-হাঁকড়ানি করে খুঁজতে হয়েছিল। ওই তদন্তের শেষ হয়েছে আজ এইখানে এবং ঘটনাক্রমে ভিটু তার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে, সে-ই প্রথম সুড়ঙ্গ পথের চিন্তা মামুর মাথায় ঢুকিয়ে দেয়।

আর ছোড়দা ? ভিটু পালিয়ে গেলে সে তো কেঁদেকেটে খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে এক বিশ্রী কাণ্ড করেছিল। টি চ্যাউড্রিই তার নিরাপত্তার খবর দিয়ে তাঁদের নিশ্চিন্ত করে দিয়েছিল। বাবা বরাবরই তাঁর আসল পরিচয় জানতেন, কারণ অনেক তদন্তেই কেমিক্যাল বিশেষজ্ঞ দরকার হয় আর সরকার তাঁকেই তলব করেন। ওঁরা সহপাঠী ছিলেন।

কী বলে ছোড়দাকে ভিটু নীচে আসতে রাজি করেছিল ? না, ওপরে গিয়েই মিথ্যে কথা বলার জন্য ভিটু ওর দুই গালে প্রচণ্ড দুই চড় কষিয়েছিল। তাই গালটা লাল দেখাচ্ছিল। মেজদা মধ্যস্থ হয়ে শান্তি স্থাপন করেছিল।

এবার আশা করি সবাই সব প্রশ্নের উত্তর পেয়েছে। এ-ও বলি, এ-গল্প মনগড়া হলেও, এ-ধরনের ঘটনা মাঝে-মাঝেই ঘটে থাকে।

(সমাপ্ত)

ছবি : দেবাশিস দেব

ধারাবাহিক উপন্যাস

কালাপাহাড়

সমরেশ মজুমদার

হোটেলের যেসব কর্মচারীকে থানায় ধরে নিয়ে আসা হয়েছিল অমল সোম তাদের জেরা করলেন। গতকাল হরিপদবাবুর কাছে কারা এসেছিলেন, হরিপদবাবুর ঘর থেকে কোনও আওয়াজ শোনা গিয়েছিল কিনা, মৃতদেহ কীভাবে আবিষ্কৃত হল ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর যা পাওয়া গেল তাতে কোনও কাজ হল না। লোকগুলো এত ভয় পেয়েছে যে, কোনও কথাই বলতে চাইছে না। কিংবা ওদের কিছুই বলার নেই। হত্যাকাণ্ড সকলের অগোচরে ঘটে গেছে। অর্জুনেরও মনে হল এমনটা ঘটা অসম্ভব নয়। হত্যাকারী সবাইকে জানিয়ে নিশ্চয়ই হরিপদবাবুর ঘরে ঢুকবে না।

থানার বড়বাবুর ঘরে ফিরে এসে অমলদা ঘড়ি দেখলেন। তারপর অর্জুনের দিকে তাকিয়ে বললেন, "তুমি কি মিসেস দত্তকে কোনও কথা দিয়েছ?"

মিসেস দত্ত! অর্জুন ঠাওর করতে পারল না। তার অবাক-হওয়া মুখের দিকে তাকিয়ে অমল সোম বললেন, "হৈমন্তীপুর চা-বাগানের এখন যিনি মালিক।"

সঙ্গে-সঙ্গে মনে পড়ে গেল অর্জুনের। ভদ্রমহিলাকে আজ দুপুরের মধ্যেই জানানোর কথা হয়েছিল কেসটা নেওয়া হবে কিনা। কিন্তু সকাল থেকে এমন সব ঘটনা ঘটতে লাগল যে, ওঁর কথা মাথায় ছিল না। অর্জুন অমল সোমের দিকে তাকাল। হৈমন্তীপুর চা-বাগানের কেসটা অমলদা নিতে পারবেন না বলে জানিয়েছেন তাকে। তা হলে হঠাৎ এ-প্রসঙ্গ তুললেন কেন? সে বলল, "আমরা তো ওর কেস নিচ্ছি না, তাই না?"

অমলদা কথা শেষ করার ভঙ্গিতে বললেন, "সেটাও তো ওঁকে জানিয়ে দেওয়া উচিত। তুমি একটা ফোন করে ওঁকে জানিয়ে দাও।"

দু'জন পুলিশ অফিসার চুপচাপ শুনছিলেন কথাবার্তা। শ্রীকান্ত বকসি হাত বাড়িয়ে টেবিলের কোণে রাখা টেলিফোন দেখিয়ে দিলেন। শিলিগুড়ি থেকে হৈমন্তীপুর চা-বাগানে টেলিফোনে কথা বলতে হলে জলপাইগুড়ি এক্সচেঞ্জ হয়ে লাইন পেতে হবে। সেসব চেষ্টা করে যখন হৈমন্তীপুর চা-বাগানের কাছের টেলিফোন এক্সচেঞ্জকে পাওয়া গেল তখন অর্জুন জানতে পারল মিসেস দত্তের বাংলো বা ফ্যাক্টরির টেলিফোন কোনও সাড়া দিচ্ছে না। সেখানকার অপারেটার জানালেন হৈমন্তীপুর চা-বাগানের টেলিফোন লাইন কাজ করছে না। রিসিভার নামিয়ে রেখে অর্জুন অমল সোমকে ঘটনাটা জানাল।

অমল সোম গম্ভীর হয়ে গেলেন। তারপর শ্রীকান্ত বকসির দিকে

তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার এলাকা যদিও নয় তবু আপনি কি হৈমন্তীপুর টি এস্টেটের ব্যাপারটা জানেন ?"

শ্রীকান্ত মাথা নাড়লেন, "শ্রমিক বিক্ষোভে বন্ধ ছিল। শেষ পর্যন্ত বাগানটা খোলা হয়েছে বলে শুনেছি। কাল জানলাম দু-একটা খুন হয়েছে সেখানে।"

"পুলিশকে জানানো সত্ত্বেও কোনও সুরাহা হচ্ছে না ?"

শ্রীকান্ত বকসি হাসলেন, "পুলিশ তো ম্যাজিসিয়ান নয়। নিশ্চয়ই খুব সাধারণ ব্যাপার নয়। কোনও-কোনও সমস্যার তো চট করে সমাধান হয় না।"

অমল সোম এবার অর্জুনকে বললেন, "ব্যাপারটা আমার ভাল লাগছে না। তুমি এখনই হৈমন্তীপুরে চলে যাও। ভদ্রমহিলা যেসব আশঙ্কা করছিলেন তাই ঘটতে শুরু হয়েছে। টেলিফোন লাইন কেটে দিয়ে তাঁকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টাও করা হতে পারে। তোমার কাছে টাকা-পয়সা আছে ?"

আজ অর্জুনের পকেটে টাকা ছিল না। সেরকম প্রস্তুতি নিয়ে সে বাড়ি থেকে বের হয়নি। অমল সোম তাকে পঞ্চাশটি টাকা দিলেন, "এদের কাছে তো কিছুই জানা গেল না তাই শিলিগুড়ি থেকে ফিরতে আমার সন্ধে হয়ে যাবে। ভদ্রমহিলাকে খবরটা দিয়েই তুমি জলপাইগুড়িতে ফিরে যেয়ো।" অমল সোম পুলিশ অফিসারদের দিকে ঘুরে তাকালেন, "আমরা কি এবার একটু চা খেতে পারি ?"

অর্জুন থানা থেকে বেরিয়ে এল। হরিপদ সেনের হত্যারহস্য খুব সহজে সমাধান হবে বলে মনে হচ্ছে না। অমলদার মুখ দেখে মনে হল তিনি এখন পর্যন্ত অন্ধকারেই আছেন। আর যেহেতু হরিপদবাবু আগাম টাকা দিয়ে গিয়েছেন তাই এই রহস্য সমাধান না করা পর্যন্ত অমলদা গম্ভীর থাকবেন। কিন্তু অর্জুন ভেবে পাচ্ছিল না এইভাবে তাড়াহুড়ো করে অমলদা তাকে কেন হৈমন্তীপুরে পাঠাচ্ছেন ? ভদ্রমহিলাকে সে বলেছিল আজকে জানাবে। সেটা আগামীকাল হলে এমন কিছু ক্ষতি হত না। হৈমন্তীপুরে না গিয়ে অমলদার সঙ্গে শিলিগুড়িতে থেকে হরিপদবাবুর আসামিকে খুঁজে বের করার চেষ্টাতেই অনেক বেশি আনন্দ ছিল। কালাপাহাড়ের উত্তরাধিকারী নবীন কালাপাহাড়ের মোকাবিলা তো এখানেই হবে। অর্জুন ঘড়ি দেখল। এখন সেবক-মালবাজার হয়ে হাসিমারা দিয়ে হৈমন্তীপুর পৌঁছে আর ফেরার বাস পাওয়া যাবে না। সন্ধের মুখেই ওদিকে বাস-চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। অর্জুন ঠিক করল মিনিবাসে জলপাইগুড়ি ফিরে গিয়ে তার নিজের মোটর বাইক নিয়ে হৈমন্তীপুরে যাবে। একটু এগিয়ে সে দেখল থানার কাছে মিনিবাস স্ট্যান্ডে কোনও বাস নেই। দেরি করা চলবে না বলে সে রিকশা নিয়ে চলে এল শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি হাইওয়েতে। এবং তখনই একটা ধাবমান ট্যাক্সি থেকে কেউ বিকট গলায় 'অর্জুন' বলে চিৎকার করে উঠল।

অবাক হয়ে অর্জুন দেখল একটা ওয়াই মার্কা অ্যাম্বাসাডার কোনওমতে ব্রেক কষতে-কষতে খানিকটা দূরে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। নিশ্চয়ই কোনও চেনা লোক, যিনি জলপাইগুড়িতে যাচ্ছেন। গাড়িটা এবার ব্যাক করছে। কাছাকাছি পৌঁছেই দরজা খুলে যিনি লাফিয়ে নেমে তাকে জড়িয়ে ধরলেন তাঁর কথা কল্পনাতেও আসেনি। দু' হাতের চাপে ততক্ষণে হাঁসফাঁস অবস্থা অর্জুনের। মেজর কিন্তু নিঃশব্দ নন। গাড়ি থেকে নামামাত্র সমানে চিৎকার করে যাচ্ছেন, "এই যে মিস্টার থার্ড পাণ্ডব, কী সারপ্রাইজ, আঃ, কতদিন পরে দেখলাম আমাদের গ্রেট ডিটেকটিভকে, লম্বা হয়েছ, উঁহু, একটুও মোটা হওনি, দ্যাটস ফাইন, অমলবাবুর খবর কী ?"

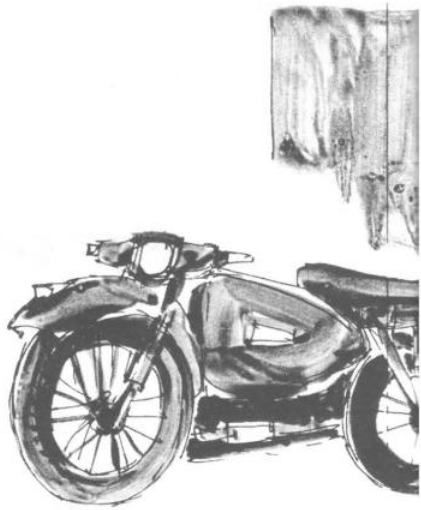

কোনওমতে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে লম্বা-চওড়া দাড়িওয়ালা মানুষটির মুখে সরল হাসি দেখল অর্জুন। তারপর জিজ্ঞেস করল, "আপনি কেমন আছেন ?"

"খুব ভাল। যাকে বলে ফার্স্ট ক্লাস। একটু বুড়ো হয়েছি এই যা।" বলে আকাশ-ফাটানো হাসি হাসলেন। অর্জুনের মনে হল এই মানুষটি একইরকম রয়েছেন। সেবার কালিম্পং থেকে শুরু করে আমেরিকা-ইউরোপে সে মেজরের সঙ্গে দিনের পর দিন থেকেছে। মেজরকে দেখলেই মনে হত হার্জের আঁকা ক্যাপ্টেন হ্যাডক রক্তমাংসের শরীর নিয়ে তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। এবার দাড়িতে সাদা ছোপ লেগেছে একটু বেশি পরিমাণে, এই যা।

ট্যাক্সিতে বসে অর্জুন বলল, "বিষ্টুসাহেবের কাছে খবর পেয়েছিলাম আপনি এদেশে এসেই কালিম্পঙে চলে গিয়েছেন। কাজ হয়েছে ?"

"কাজ ? কাজের জন্য তো আমি যাইনি। ওখানকার একজন লামা আমাকে চিঠিপত্র লিখতেন। তাঁর পেটে একটা অসুখ হয়েছে। এখানকার ওষুধে কাজ দিচ্ছে না তাই আমায় ওদেশি ওষুধ এনে দিতে লিখেছিলেন। সেটাই দিয়ে এলাম।" মাথা নাড়লেন মেজর, "এখন ক'দিন রেস্ট নেব, যাকে বলে অখ, অখ—।"

"অখণ্ড বিশ্রাম।" অর্জুন সাহায্য করল।

"ঠিক। মাঝে-মাঝে এক-একটা বাংলা শব্দ ভীষণ বিট্রে করে। তোমাদের হাতে কোনও কাজ নেই তো ? গুড। কী ? মাথা নেড়ে হ্যাঁ বললে না কি ?" চোখ বড় করলেন মেজর।

অর্জুন হাসল, "আমরা এখন তিনটে কেসে জড়িয়ে পড়েছি।"

"তিন-তিনটে ? কোনও গোয়েন্দা একসঙ্গে তিনটে কেস করে না। আমি তো অন্তত পড়িনি। ইভ্‌ন শার্লক হোমস ! তিনটে ডিফারেন্ট কেস ?"

"না। দুটো গায়ে-গায়ে। একটা আলাদা।"

"ইন্টারেস্টিং। বলে ফ্যালো ব্যাপারটা।" কথাটা বলেই মেজর

সোজা হয়ে সামনের সিটের দিকে তাকালেন। সেখানে ড্রাইভার আপনমনে গাড়ি চালাচ্ছে। লোকটি নেপালি। সম্ভবত মেজর কালিম্পং থেকেই তাকে ভাড়া করেছেন। মেজর তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "আপ ইংলিশ জানতা হ্যায় ?"

"ইয়েস সার।" লোকটি মুখ না ফিরিয়ে জবাব দিল।

"হিন্দি তো জানতা হ্যায়। বেঙ্গলি ? বাংলা ?"

"অল্প-অল্প।"

"ডেঞ্জারাস। তা হলে তো থার্ড পার্সনের সামনে আলোচনা করা যাবে না অর্জুনবাবু। কী করা যায় ?" মেজরকে খুব চিন্তিত দেখাল।

অর্জুন এতক্ষণ ড্রাইভারের অস্তিত্ব খেয়াল করেনি। কিন্তু তার মনে হল মেজর একটু বেশি চিন্তা করছেন। কালিম্পঙের একজন নেপালি ড্রাইভারের কোনও স্বার্থ থাকতে পারে না কালাপাহাড়ের কেসে। কিন্তু মেজর যেভাবে গম্ভীর মুখে এখন বসে আছেন, তাতে বোঝা যাচ্ছে তিনি সত্যিই তৃতীয় ব্যক্তির সামনে মুখ খুলতে চান না। কিছুক্ষণের মধ্যে ব্যাপারটা খুব মজাদার হয়ে দাঁড়াল। গাড়ি চলছে জলপাইগুড়ির দিকে কিন্তু কেউ কোনও কথা বলছে না। মেজর গম্ভীর হয়ে রাস্তা দেখতে-দেখতে ঘুমিয়ে পড়লেন। এবার তাঁর নাকডাকা শুরু হয়ে গেল। সেইসঙ্গে ড্রাইভারও মুখ ফিরিয়ে পেছনে তাকাল। কথা বন্ধ করামাত্র কোনও মানুষ এমন চট করে গভীর ঘুমে ঢুকে যেতে পারে তা মেজরকে না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত।

অমল সোমের বাড়ির সামনে পৌঁছে ট্যাক্সি ছেড়ে দেওয়া হল। সুটকেস নামিয়ে মেজর হাত-পা আকাশে ছোঁড়ার চেষ্টা করলেন, "একটু সময় নিয়ে স্নান করা যাবে, কী বলো ?"

"আপনি স্নান করুন। বিষ্টুসাহেব নিশ্চয়ই এখন বিশ্রাম নিচ্ছেন। হাবুদা আছে। আমাকে এখনই বাইক নিয়ে ছুটতে হবে হৈমন্তীপুরে।"

"সেটা কোথায় ?"

"এখান থেকে প্রায় একশো কিলোমিটারের বেশি দূরে একটা চা-বাগান।"

"বাট হোয়াই ? যাচ্ছ কেন ?"

"ওই যে তখন বললাম, তিন-তিনটে কেসের কথা। এটি তার একটা।"

মেজর গেট খুলে সুটকেস নিয়ে ভেতরে ঢুকতেই হাবুকে দেখা গেল। হাবু বাগানে দাঁড়িয়ে মেজরকে দেখছিল সম্ভবত। তার মুখের ভঙ্গি সুখকর নয়। মেজরকে হাবু অপছন্দ করছে। মেজর জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার নাম হাবু ? গুড। সুটকেসটা ভেতরে রাখো। বিষ্টুসাহেব কী করছেন ? অমলবাবু কোথায় ?"

পাশে দাঁড়িয়ে অর্জুন বলল, "আপনি বোধ হয় ভুলে গিয়েছেন হাবুদা কানে শোনে না এবং কথাও বলতে পারে না। অমলদা এখন শিলিগুড়িতে।"

"শিলিগুড়িতে কেন ?"

"ওই কেসের ব্যাপারেই ওখানে গিয়েছেন।"

"আশ্চর্য ! তখন থেকে কেস-কেস করছ অথচ ঘটনাটা বলছ না !"

"কী করে বলব ? আপনি তো ঘুমোচ্ছিলেন।"

"ঘুমোচ্ছিলাম ? আমি ? ইম্পসিব্‌ল। চোখ বন্ধ করে ভাবছিলাম। ও হ্যাঁ, মনে পড়েছে, ড্রাইভারটা ছিল, তাই আমরা আলোচনা করিনি। কিন্তু এই হাবুচন্দ্রের সঙ্গে তোমরা কম্যুনিকেট করো কী করে ?"

"আপনি সব ভুলে গেছেন। হাবুদা ঠিক বুঝে নেয়। তা হলে আপনি বিশ্রাম করুন। হাবুদা, ইনি বিষ্টুসাহেবের সঙ্গে থাকবেন। স্নান-খাওয়ার ব্যবস্থা করো।" কথা বলার সঙ্গে আঙুলের ইঙ্গিতে বক্তব্য বুঝিয়ে অর্জুন তার নিজের বাইকটার দিকে এগিয়ে গেল। মেজর কয়েক পা হেঁটে হাবুর হাতে সুটকেস ধরিয়ে দিয়ে অর্জুনের সঙ্গে গেট পর্যন্ত এলেন। অর্জুন এঞ্জিনে স্টার্ট দেওয়ামাত্র বললেন, "তোমার হাত পাকা তো ? আমার আবার বাইকে উঠতে খুব নার্ভাস-নার্ভাস লাগে !"

"আপনি উঠবেন মানে ?" অর্জুন অবাক।

"অদ্ভুত প্রশ্ন তো !" মেজর খিঁচিয়ে উঠলেন, "উনি যাবেন একশো কিলোমিটার দূরে কেস করতে, আর আমি এখানে বসে সজনের ডাঁটা খাব ? তা ছাড়া তিন-তিনটে কেসের গল্প এখনও শোনা হয়নি।" মেজর বাইক নাচিয়ে পেছনের সিটে বসে বললেন, "পেছনের চাকার হাওয়া ঠিক আছে তো ?"

অর্জুন কাতর চোখে তার বাইকের চাকা দেখল। এই লাল বাইকের ওপর তার খুব মায়া। কাউকে হাত দিতে দেয় না। মেজরের ভারী শরীর বইলে বাইকটার ক্ষতি হবে কিনা বুঝতে পারছিল না সে। তবু শেষ চেষ্টা করল, "আপনি স্নান করে বিশ্রাম নেবেন বলছিলেন !"

"বিশ্রাম আমার কপালে নেই ভাই। চলো।"

অগত্যা চাকা গড়াল। পেছনের ভার খানিকক্ষণ বাদেই সয়ে গেল অর্জুনের। মেজর এবার তাকে প্রায় আঁকড়ে ধরেছেন। অর্জুন তাঁকে সহজ হয়ে বসতে বলায় তিনি রেগে গেলেন, "নিজে মাথায় হেলমেট পরেছ, আমার মাথা খালি, ছিটকে পড়লে কী হবে ভেবে দেখেছ ? হ্যাঁ, এবার বলো, হৈমন্তীপুর নাকি ছাই, সেখানে কী হচ্ছে ?"

বাইকে স্পিড বাড়িয়ে তিস্তা ব্রিজের দিকে যেতে-যেতে অর্জুন হাওয়ার ওপর গলা তুলে বলল, "খুন হচ্ছে।" (ক্রমশ)

ছবি : সুব্রত চৌধুরী

ANNOUNCING THE FIRST MAJOR INTERNATIONAL CONFERENCE ON DRUG ABUSE.

The most renowned names in the field of drug abuse prevention the world over, are preparing for Combat—the conference on drug abuse to be held in the first week of March, 1991.

Among other things, they intend to form a pressure group which would motivate national governments to contain illegal drug trafficking.

They will also develop a strategy to accelerate prevention and rehabilitation programmes. And review the latest developments on this front.

You are welcome to join forces with them, if you share their fighting spirit.

Registration forms for the conference are available with ivedita Sen at Indian Chamber of Commerce, 7th Floor, 4, India Exchange Place, Calcutta.

Send your forms along with the registration fee of Rs 750 (for Calcutta delegates)/Rs 1000 (for outstation delegates), to the Secretary, Organising Committee, SAPC Secretariat, Indian Chamber of Commerce, 4, India Exchange Place, Calcutta 700001, so as to reach us by 15 December 1990.

Wouldn't you prefer to be part of the action, rather than hear about it from someone else?

SUBSTANCE • ABUSE • PREVENTION • CELL
CITIZEN ACTION FORUM
INDIAN CHAMBER OF COMMERCE

PRINCIPAL SPONSOR — ***TATA STEEL***

শেষ বস্তা !
!
?
ইভান !
থামো !
থামো !···নইলে গুলি করব !
ও আমাকে বুদ্ধু ভেবেছে !···অন্ধকারে আমাকে গুলিতে ঘায়েল করার আশা দুরাশা !
তোমাকে সতর্ক করছি !
দুম
!?
গুলি কোরো না !···আমি ধরা দিচ্ছি···আমি মরতে চাই না !
?

কৃষ্ণদ্বীপের রহস্য

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

ব্যাট ম্যান
আদ্যিকালের এক হেলেদুলনো ছড়ার সূত্র খুঁজে বুদ্ধির লড়াই শেষ করে ব্যাটম্যান আর রবিন 'কুটিল মানুষ'-কে খুঁজে পেল এক অফিস-বাড়িতে। কুটিল মানুষ দেরাজ থেকে বের করল—এক বিল...
বিল ? কেন ?
কাজের জন্য—কিন্তু আপনার সঙ্গে আর ব্যবসা করব না, সার, তা বলে দিচ্ছি !
নমস্কার, মিঃ মেলভিল। কাল রাতের কাজটা নিয়ে কিছু কথা বলার ছিল—আরে ! সশরীরে ব্যাটম্যান আর রবিন !
মিঃ ডেভিস !!
অ্যাঁ ! আ-পনি সত্যি ব্যাটম্যান, তাই না ?
নিশ্চয় ! কিন্তু ব্যাপারটা কী, একটু বুঝিয়ে বলবেন ?
মিঃ ডেভিস, কাজটা করার কথা ছিল আজ, কাল রাতে নয় !
ওহ্—না ! আমি ভাবলাম— কী বিভ্রাট !
সব বুঝিয়ে না বললে বিভ্রাট আমিই বাধাব !
আমার বাচ্চা ভাইপো, রবিনের বয়েসী, ওর খুব ভক্ত— আর আমি, আপনার ! তা—আমাদের ইচ্ছে ছিল এক রাতে আমরা ব্যাটম্যান আর রবিন হব—তাদের মতো রহস্যে জড়িয়ে পড়ব। তাই মিঃ মেলভিলের সঙ্গে চুক্তি করি। উনি...
...'রহস্য-রোমাঞ্চ' কম্পানির পরিচালক। আমরা টাকা নিয়ে রোমাঞ্চ সরবরাহ করি। যারা উত্তেজনা খোঁজে, যারা বিপন্ন সুন্দরীকে উদ্ধার করতে চায়, ইত্যাদি...
ঐরা আমার নাট্যকার ! অভিনেতারা সংলাপ মুখস্থ করে, আর খদ্দেরকে এমন উত্তেজক পরিবেশে ফেলে দিই যার কথা সে জীবনে ভোলে না !
মিঃ ফিচের জন্য 'রক্তিম মৃত্যু' নাটক তৈরি ! দারুণ জমবে !
তারিখের গোলমালে আপনাকে আর রবিনকে ছদ্মবেশী মিঃ ডেভিস আর তাঁর ভাইপো বলে ভুল করেছিলাম !
ওখানে তখন আপনাদের উপস্থিতি কাকতালীয় এবং দুর্ভাগ্যজনক ! দোষটা আমার ! আমি দুঃখিত !
কেন ? আমরা যে-মজা পেয়েছি তার তুলনা নেই।
আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি ! কুটিল মানুষ আমাদের ধাঁধায় ফেলেছিল !
হ্যাঁ, ভাল ! মিঃ ডেভিসের জন্য ওটা তুলে রেখেছিলাম !
কুটিল মানুষ ! নামটা রোমাঞ্চকর শোনাচ্ছে !
শুধু রোমাঞ্চকর ? দুর্দান্ত ! শুরুটা কেবল শুনুন...
হুম্ ! রবিন, চলো !
নিবিড় অন্ধকার রাত্রি—ঘুমন্ত শহর নিস্তব্ধ—হঠাৎ ছুটে এল এক ছায়াশরীর...
আমরা এখানেই ঢুকেছিলাম !

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

ধারাবাহিক উপন্যাস

সোনার গনপতি তিরের চোখ

ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়

লোহার শিকল শুধু হাতে কাটব বললেই কাটা যায় না। তার ওপর প্রত্যেককে পাকে পাকে জড়িয়ে তালা মেরেছে।

শুভঙ্কর বলল, "ভয় নেই। তোমরা সবাই মুক্তি পাবে। আমরা তোমাদের মুক্তি দেব বলেই এসেছি। কিন্তু তালার চাবিটা কার কাছে বা কোথায় আছে বলতে পারো?"

"চাবি তো ওদের কাছে।"

"চাবি না পেলে কী করে খুলব?"

তিন্নি বলল, "একটা পেরেক অথবা তালাটা ভাঙার মতো একটা ভারী পাথর পেলেও হয়।"

বিল্টু আর তিন্নি তখন আলো নিয়ে চারদিক খুঁজতে লাগল। খুঁজতে-খুঁজতে হঠাৎই এক জায়গায় একটি মরচে-ধরা পেরেক কুড়িয়ে পেল ওরা। বিল্টু সেই পেরেকটা এনে তালার মধ্যে ঢুকিয়ে বেশ কিছুক্ষণ ধরে নাড়াচাড়া করতেই খুট করে খুলে গেল তালাটা।

তালা খুলতেই চেন খুলে দেওয়া সহজ হয়ে গেল। মুক্তি পেল সকলেই। মুক্তির আনন্দ বড় আনন্দ। ছেলেমেয়েগুলো যেন হতের মুঠোয় স্বর্গ পেল। তবে এখন মুক্তি পেলেও তো বাইরে বেরনো যাবে না। উন্মত্ত হাতির দল চারদিকে ছুটোছুটি করছে এখন।

শুভঙ্কর দড়ির মই বেয়ে আর-একবার ওপরে উঠে বাইরের অবস্থাটা দেখল। দূরের ঠাকরুনপাহাড়ির পাহাড়ে ও গ্রামে শুধু মশালের আগুন নিয়ে লোকজন ছুটোছুটি করছে। চারদিক থেকে সমানে ভেসে আসছে টিন পেটানোর শব্দ। সেইসঙ্গে শোনা যাচ্ছে মত্ত হাতির ভীষণ গর্জন। সেই ভয়ঙ্কর শব্দে আতঙ্কিত চারদিক। তাই দেখে বাইরে বেরনোর সব আশা ছেড়ে দিয়ে আবার নেমে এল ও। বলল, "নাঃ, আজ আর এখান থেকে পালাবার কোনও পথ নেই। বাইরে বেরোলেই অবধারিত মৃত্যু। এসো, আমরা সবাই বরং রাত জেগে বসে-বসে গল্প করি।"

বিল্টু বলল, "বাইরেকার অবস্থা তা হলে খুবই খারাপ?"

"খুব খারাপ। তবে এখানকার স্থানীয় অধিবাসীরা তো জেনে গেছে। তারা দেখেছে যে আমরা এখানে আছি। তাই পরিস্থিতি শান্ত হলে ওরাই এসে উদ্ধার করবে আমাদের।"

বিল্টু, তিন্নি ও শুভঙ্কর সদ্য মুক্ত ছেলেমেয়েগুলোর সঙ্গে বসে এবার আলাপ-পরিচয়ে মেতে উঠল। তাদের অপহৃত হওয়ার বা

তাদের ওপর অকথ্য অত্যাচারের মর্মন্তুদ কাহিনী মনোযোগ দিয়ে শুনতে লাগল ওরা।

এইভাবে সারাটা রাত ওরা কাটিয়ে দিল প্রবল উত্তেজনায়। কারও চোখেই ঘুম এল না। এদের সঙ্গেই কথোপকথনে ওরা জানতে পারল, দু-তিনদিনের মধ্যে কোনও নতুন ছেলেমেয়ে এখানে আসেনি। তাই মউয়ের ব্যাপারটা রহস্যময়ই রয়ে গেল।

ভোরের আলো ফুটে ওঠার পর গুহার বাইরে থেকে একটা প্রচণ্ড কোলাহল ওদের কানে আসতে লাগল। ওরা বুঝতে পারল নিশ্চয়ই কোনও উদ্ধারকারী দল ওদের খোঁজে এখানে এসেছে।

শুভঙ্কর একটুও দেরি না করে সেই দড়ির মই বেয়ে ওপরে উঠেই দেখল শ'য়ে-শ'য়ে আদিবাসী লাঠিসোঁটা নিয়ে হাজির হয়েছে সেখানে। তাদের নেতৃত্বের পুরোভাগে রয়েছে গুইরাম মাহাতো। সেইসঙ্গে চারদিক ঘিরে আছে অসংখ্য পুলিশ। আর সেই পুলিশের মাঝখানে সসম্মানে মাথা উঁচু করে যিনি দাঁড়িয়ে আছেন তাঁকে দেখেই চমকে উঠল শুভঙ্কর। আনন্দে-উত্তেজনায় কী যে করবে ও তা ভেবে পেল না। গুহার দিকে মুখ করে সে চিৎকার করে বলল, "ওরে তোরা জেনে রাখ, আর আমাদের কোনও ভয় নেই। আমার বাপি এসে গেছেন। কী মজা!"

শুভঙ্করের কথায় উল্লসিত হয়ে সবাই ছুটে এল হইহই করে। তারপর সেই ঝোলানো দড়ির মই ধরে এক-এক করে ওপরে উঠল। এবং ওই একইভাবে নীচে নামল সকলে।

ডি· এস· পি· শিবশঙ্কর দত্ত ছুটে এসে জড়িয়ে ধরলেন ছেলেকে। বললেন, "তুই ভাল আছিস তো বাবা? কোথাও কোনও আঘাত পাসনি?"

শুভঙ্কর বলল, "আমি খুব ভাল আছি। কিন্তু তুমি কী করে জানলে আমরা এখানে আছি?"

"উঃ, তুই যা ভাবিয়ে দিয়েছিলি না আমাদের!"

"তা তো দিয়েছিলাম। কিন্তু তুমি খবর পেলে কী করে?"

"কী করে পেলাম? এই দ্যাখ তবে।" বলে বড় একটি গাছের আড়াল থেকে যার হাত ধরে টেনে আনলেন তাকে দেখেই তো চমকের পর চমক।

বিস্মিত শুভঙ্কর বলল, "এ কী মউ! তুমি এখানে? আমরা তামার খোঁজেই এখানে এসেছি।"

শিবশঙ্করবাবু বললেন, "এই মেয়েটিই তো খবর দিয়ে আমাদের আনাল। তবে তোকে যে ফিরে পাব তা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। তোকে না সেই কুখ্যাত ডাকাতটা জলে ফেলে দিয়েছিল?"

"হ্যাঁ বাপি। আমি কোনওরকমে প্রাণে বেঁচে গেছি। কিন্তু চিন্তা হচ্ছিল মউয়ের জন্য।"

এমন সময় গুইরাম মাহাতো ভিড় কাটিয়ে এসে বলল, "আমি আপনাকে বলিনি সার! আপনার ছেলে বেঁচে আছে। ওরা আমাকে সব কথা বলেছে। তাই তো আমি সাহস করে বলতে পারলুম আপনাকে যে, আপনার ছেলে মরেনি।"

তিন্নি তখন মউকে জড়িয়ে ধরে হাউ-হাউ করে কাঁদছে।

বিল্টু তিন্নিকে ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, "ছিঃ কাঁদিস না। এখন কি কান্নাকাটির সময়? আজ আমাদের কত আনন্দের দিন বল তো? আমরা সবাই সবাইকে ফিরে পেলাম। এর চেয়ে সুখের আর কী আছে?"

শুভঙ্কর মউকে বলল, "কিন্তু ওই শয়তান জঙ্গলশেরটার হাত থেকে তুমি কী করে রক্ষা পেলে মউ? কে তোমাকে বাঁচাল?"

মউ বলল, "কেউ আমাকে বাঁচায়নি। কেউ এসে রক্ষা করেনি। জঙ্গলশেরকে আমি খুন করেছি। তবে প্রাণে বেঁচেছি গণপতির দয়ায়।"

"কীরকম শুনি?"

"তোমাকে তো জঙ্গলশের লাথি মেরে ফেলে দিল। তারপর আমি ওকে প্রচণ্ড রকমের বাধা দিতে শুরু করলাম। ও আমার একটা হাত এমনই শক্ত করে ধরে রইল যে, আমি সে-হাত কিছুতেই ছাড়াতে পারলাম না। দুরন্ত ডুলুংয়ের প্রবল জলস্রোতে লক্ষ্যহীনভাবে ভেসে চলল ভেলাটা। তারই গতিবেগে আমরা টাল সামলাতে না পেরে হুমড়ি খেয়ে পড়লাম ভেলার ওপর। আর সেই ফাঁকেই আমার গুপ্তস্থান থেকে ছুরিটা বের করে ওকে এতটুকুও সতর্ক হওয়ার সুযোগ না দিয়ে গলার নলিটা দু' ফাঁক করে দিলাম ওর। দিয়ে তোমাকে যেভাবে লাথি মেরে ফেলে দিয়েছিল ঠিক সেইভাবেই লাথি মেরে ফেলে দিলাম ওকে। ওর দেহটা স্রোতে ভেসে কোথায় যেন তলিয়ে গেল। এদিকে আমাদের দাপাদাপিতে লগিটাও কখন পড়ে গেছে জলে। তাই কোনওভাবেই ভেলাটাকে আমি ভেসে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করতে পারলাম না। অতএব ভাগ্যের হাতে সব কিছু ছেড়ে দিয়ে বসে থাকতে-থাকতে এক সময় রোহিণীর কাছে ডুলুং যেখানে সুবর্ণরেখায় পড়ছে সেইখানে ধাক্কা খেয়ে ভাঙনের গায়ে ঘন

আঁকিবুকি — রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

এঁকে দারুণ মজা

দ্যাখো, এবারে আঁকার পাতায় ফুটে উঠেছে কী ছবি। গত সংখ্যায় তোমরা আভাস দেখে কী কল্পনা করেছিলে মনে করো। তারপর নিজের কল্পনা মতো এঁকে ফ্যালো বিড়াল, কুকুরের ছবি। এঁকে মজাও পাবে খুব।

হাসিখুশি — শতদল

বাবু বলছে টুটুকে, "তোমাকে আমার এত ভাল লাগে কেন জানো? তোমার এত বড় সাফল্য তোমাকে এতটুকুও অহঙ্কারী করে তোলেনি বলে।"

টুটুর উত্তর, "আমি এইজন্য অহঙ্কারী হতে যাব কেন? আমি তো বরাবরই জানি যে, আমি সকলের চেয়ে একেবারে আলাদা।"

রামবাবু : গতকাল রাত্রে আমাদের উপরতলার ভাড়াটেরা বড় উপদ্রব করেছে, রাত সাড়ে বারোটা নাগাদ ধুপধাপ করে

নেচেছে।

শ্যামবাবু : কী অন্যায় কথা, আপনার ঘুমের তো খুব ব্যাঘাত হল দেখছি।

রামবাবু : আরে না না, রাত সাড়ে বারোটায় তো আমি ঘুমোই না, তখন তো আমার গলা সাধাই শেষ হয় না।

ছবি : দেবাশিস দেব

কাশবনের গোছা ধরে কোনওরকমে তীরে নামি। তারপর গ্রামবাসীদের সাহায্য নিয়ে পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করি ও সব কথা খুলে বলি। ইতিমধ্যে তোমার বাবা ঘাটশিলা থানার সঙ্গে যোগাযোগ করে সব কিছু জেনে তোমার খোঁজে এসে পড়েছিলেন। তাই এত সহজে পিতাপুত্রের মিলন হল।"

আদিবাসীরা তখন সবাই এসে পাকড়েছে শিবশঙ্করবাবুকে। বলল, "দেখুন বাবু, আমরা গরিব হতে পারি, তবে অসৎ নই। তাই বলি, আপনারা সর্বাগ্রে ওই পাহাড়ের ওইসব গুহাগুলোকে বোজাবার ব্যবস্থা করুন। না হলে ওগুলো থাকলেই যতসব চোর-ডাকাতের দল এসে ঘাটি করবে ওখানে। আর বদনাম হবে আমাদের। বরং ওইগুলো বুজিয়ে এইখানে এই যে খনিটা আছে এটাকে আবার কাটাবার ব্যবস্থা করুন। তাতে করে আমরা বা আমাদের ছেলেপুলেরা একটু কাজটাজ পাব। আমরা খুব গরিব দুঃখী লোক বাবু।"

শিবশঙ্করবাবু বললেন, "বেশ বেশ। বেশ কথা বলেছ তোমরা। আমি নিজে চিঠি লিখে বিভাগীয় মন্ত্রী মহোদয়কে জানাব, যাতে তিনি সদয় হয়ে তোমাদের পাশে এসে দাঁড়ান।"

গুইরাম বলল, "আর খবরের কাগজওয়ালাদেরও একটু বলবেন বাবু, যাতে এই জায়গাটার নামটামগুলো একটু ছেপে দেয়।"

"তা হলে ?"

"তা হলে কলকাতা থেকে বাবুরা সব এখানে বেড়াতে আসবেন। আসবেন পিকনিক করতে। আর এই গরিব গুইরাম মাহাতোর দোকানে কেনাবেচা হবে। বেলপাহাড়িতে একটি বেলগাছও নেই অথচ সেখানকার ঢাক খুব বাজে। আর এই ঠাকরুনপাহাড়ি প্রকৃতির স্বর্গরাজ্য। কিন্তু এর নাম কেউ জানে না।"

শিবশঙ্করবাবু বললেন, "ঠিক আছে। কাগজওয়ালাদেরও তোমাদের জন্য কিছু করতে বলে দেব আমি। তবে একটিমাত্র শর্তে।"

"বলুন কী শর্ত ?"

"শহর থেকে লোকজন এলে তাদের নিরাপত্তার দায়িত্ব কিন্তু তোমাদেরকেই নিতে হবে। তাদের যাতে কোনও বিপদ-আপদ না হয় বা কেউ তাদের সঙ্গে যেন দুর্ব্যবহার না করে সে-দিকটা তোমাদের দেখতে হবে।"

"নিশ্চয়ই দেখব। আমরা কথা দিলাম। এই যে আপনাদের ছেলেমেয়েগুলো এখানে এল, আমরা থাকতে তাদের কোনও কষ্ট হয়েছে কী ? আপনি আসার আগে আমরা তো নিজে থেকেই ওদের সাহায্য করব বলেই তৈরি হয়েছিলাম।"

শিবশঙ্করবাবু গুইরাম মাহাতোর পিঠ চাপড়ে বললেন, "ধন্যবাদ। আমি খুব খুশি হয়েছি তোমাদের কাজে।" বলে সকলকে নিয়ে ধীরে-ধীরে এগোতে লাগলেন ঠাকরুনপাহাড়ির দিকে। যেতে-যেতে এখানকার পুলিশ অফিসারদের বললেন, "এরা কিন্তু একটা কথা ঠিকই বলেছে। ওই গুহাগুলোর দিকে এবার আপনারা নজর দিন। হয় ওগুলোকে উড়িয়ে দিন ডিনামাইট দিয়ে, অথবা পাথর সাজিয়ে মুখগুলো ব্লক করে দিন। তা হলে এইসব দুষ্টচক্রের প্রভাব অনেক কমে যাবে।"

(ক্রমশ)

ছবি : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

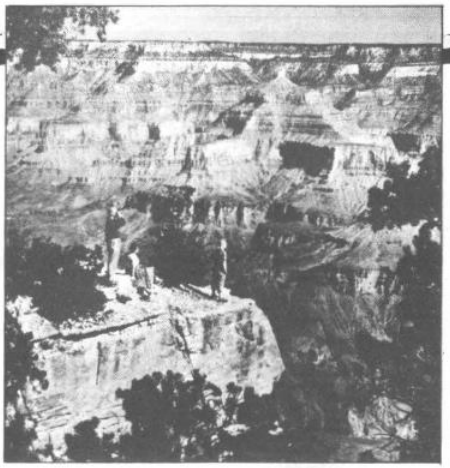

গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন যেন প্রকৃতির জাদুঘর

গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন প্রকৃতির এক বিস্ময়। কলোরাডো নদীর প্রবাহপথে, রঙিন পাথরে গড়ে উঠেছে প্রকৃতির নিজস্ব এক খেলাঘর।

এখানে-ওখানে বিপদসঙ্কুল গিরিখাত সৃষ্টি করে, আঁকাবাঁকা পথে প্রবল গতিতে ছুটে চলেছে আমেরিকার অন্যতম এক বিশাল নদী। নাম তার কলোরাডো। আরিজোনার উত্তরে উটা সীমান্ত থেকে শুরু করে পূর্বদিকে নেভাদা সীমান্ত অবধি এই নদীর গতিপথ প্রায় ২১৭ মাইল লম্বা। আর, এই পথেই সৃষ্টি হয়েছে পৃথিবীর অন্যতম এক ভূতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য, 'গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন'! অসাধারণ এই খাত বা 'ক্যানিয়ন'-এর অন্যতম দৃষ্টিনন্দন অংশটি হল 'গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন ন্যাশনাল পার্ক'-এর ৫৬ মাইল লম্বা অংশটি। খাতের তলদেশ এখানে ক্যানিয়নের বেড় থেকে প্রায় ৫৩০০ ফুট নীচে।

গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন পৃথিবীর অন্যতম এক প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। পৃথিবীর অনেক বিখ্যাত প্রাকৃতিক দৃশ্যই এখানকার সৌন্দর্যের কাছে হার মেনে যায়। খাড়া পাহাড়ের দেওয়ালে প্রকৃতির নিজের হাতে করা গাঢ় লাল রং। সেইসঙ্গে পাথরের স্তরে-স্তরে লুকিয়ে আছে তামাটে, ধূসর, সবুজ, বাদামি, বেগুনি সব রং। এ-সবই প্রকৃতির নিজস্ব খেয়াল।

এই ক্যানিয়নের দক্ষিণ বেড় সারা বছর দর্শকদের জন্য খোলা, উত্তরের বেড়টি বরফের রাজ্যে, প্রায় ৮২০০ ফুট উঁচু এক পাহাড়চূড়ায় অবস্থিত। শীতকালে এটি বন্ধ থাকে। এই দুই বেড় থেকেই গোটা ক্যানিয়নের সামগ্রিক দৃশ্য দেখা যায়। এই দুই বেড় ২১ মাইল লম্বা, আঁকাবাঁকা এক পথে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত। নিরক্ষীয় বৃত্ত থেকে মেরুপ্রদেশীয়... সবরকম গাছপালা, প্রাণিজগতের অসাধারণ এক বৈচিত্র্যের সম্ভার ঘটেছে এই পথে। পায়ে হেঁটে বা খচ্চরের পিঠে চড়ে এই পথে অভিযান করা যায়, র‍্যাফ্‌ট আর মোটরবোটে করে অভিযান চালালে উপভোগ করা যায় নদী-বরাবর যাবতীয় সব প্রাকৃতিক সৌন্দর্য।

ভূতাত্ত্বিক দিক দিয়ে বিচার করলে গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন পৃথিবীর এক কোটি বছর আগের এক দলিল।

তলদেশের বেশিরভাগ পাথরই রীতিমত প্রাচীন যুগের, বহুকাল ধরে ক্ষয়ে যাওয়া সব পর্বতের মূলদেশ। বিচ্ছিন্নভাবে থেকে যাওয়া গ্রানাইট পাথর। খাড়া পর্বতের রঙিন পাথুরে দেওয়াল বিভিন্ন সব মার্বেল পাথর ও চুনা পাথর দিয়ে গঠিত। দশ লক্ষ বছর আগে কলোরাডোর প্রকৃতি থেকে এইসব পাথর বিদায় নিয়েছে।

প্রি-ক্যাম্‌ব্রিয়ান যুগে ভূত্বকের নানারকম চাপে ও তাপে এইসব পাথর ভঙ্গিল হয়ে গিয়েছিল, ভাঁজ হতে-হতে এরা ক্রমশ ক্ষয়ে যায়। এই আপাত-মসৃণ, ক্ষয়ে যাওয়া পাথুরে তলের ওপরে পড়েছে রঙিন সব পাথর ও খোলকের স্তর।

সাম্প্রতিক এক হিসেবে দেখা গেছে কলোরাডো নদীটি প্রতিদিন গড়ে প্রায় পাঁচ লক্ষ টন পলি বহন করে। বেড়ের কাছেই রয়েছে লাভাগঠিত উঁচু মালভূমি অঞ্চল। সেইসঙ্গে রয়েছে আধুনিককালের সব আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ। এর কোনও-কোনওটা হয়তো গত এক হাজার বছরের মধ্যেই রীতিমত জীবন্ত হয়ে উঠেছিল। শেষ বিস্ফোরণ ঘটেছিল ফ্ল্যাগস্টাফের কাছে 'সানসেট' জ্বালামুখে, ১০৬৫ সালে।

ক্যানিয়নের এই ভূস্তরে রয়েছে বিচিত্র এক জীবজগতের স্বাক্ষর। প্রাণিজগতের বিবর্তনের বেশ আদিম কিছু নিদর্শন আজও রয়েছে প্রকৃতির বিচিত্র এই জাদুঘরে। আদিযুগের শৈবাল, ঝিনুকের ফসিল থেকে শুরু করে ডায়নোসর, উট, ঘোড়া, হাতি, স্লথ ইত্যাদি বিশালাকৃতি সব জীবের হাড়গোড় এখানে খুঁজে পাওয়া যায়।

প্রাগৈতিহাসিককালে মানুষ যে এখানে ঘরবাড়ি তৈরি করেছিল, তার অসংখ্য প্রমাণ আছে। মানুষ বাস করত এখানে পাহাড়ের খাড়া ঢালে। ছিল আদিম সব ঘরবাড়ি। আজকাল অবশ্য শুধুমাত্র হাভাসুপাই উপজাতির রেড ইন্ডিয়ানরাই এখানে বাস করেন। পার্কের পশ্চিম সীমানা ঘেঁষে, ক্যানিয়নের দক্ষিণ কিনারায় ছোট্ট একটি উপনিবেশ বানিয়ে এঁরা বসতি স্থাপন করেছেন। এই উপজাতির মানুষরা 'ইয়ুমান' ভাষায় কথা বলেন, ১৭৭৬ সালে যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হওয়ার ঢের আগে থেকেই এঁরা এখানকার স্থায়ী বাসিন্দা।

অসাধারণ সৌন্দর্যের জন্য বিখ্যাত ক্যানিয়ন ন্যাশনাল পার্ক। এই 'জাতীয় অরণ্য'টিতে রয়েছে প্রাণিজগতের বিচিত্র এক সম্ভার। প্রায় দুশোরকম বিভিন্ন প্রজাতির পাখি, ষাটরকম প্রজাতির স্তন্যপায়ী ও পনেরোরকম বিভিন্ন প্রজাতির উভচর ও সরীসৃপের খোঁজ পাওয়া গেছে এই অঞ্চলে।

শ্বেতাঙ্গ অভিযাত্রীরা প্রথম এই ক্যানিয়ন দেখেছিলেন আজ থেকে প্রায় সাড়ে চারশো বছর আগে। তারও আগে, আনুমানিক ১২০০ খ্রিস্টাব্দে পুয়েবলো উপজাতির রেড ইন্ডিয়ানরা এখানে সাতশোটি বসতি স্থাপন করেছিল। ১৫৪০ সালে 'কলোরাডো অভিযান'-এর অভিযাত্রীরা সর্বপ্রথম অসাধারণ এই স্থানের কথা উল্লেখ করেছিলেন। ক্যাপ্টেন গার্সিয়া লোপেজ দ্য কার্ডেনাস সেই অভিযানে সিবোলার পৌরাণিক সাতটি শহর খুঁজতে বেরিয়েছিলেন। শিকারি জেমস ও'প্যাটি ১৮২৬ সালে আচমকা পৌঁছে গিয়েছিলেন ক্যানিয়নের দক্ষিণ বেড়ে।

বিজ্ঞানসম্মত অভিযান অবশ্য শুরু হয়েছিল ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে। জন ওয়েসলি পাওয়েল সেবার কলোরাডো নদী বরাবর চালিয়েছিলেন ভূতাত্ত্বিক অনুসন্ধান। আর, ১৮৯০ সাল থেকেই এই স্থানটি পর্যটকদের অন্যতম এক আকর্ষণ। ৬ লক্ষ ৭৩ হাজার একর জায়গা নিয়ে এখানকার ন্যাশনাল পার্কটি প্রথম সরকারিভাবে সংরক্ষিত হয়েছিল ১৯১৯ সালে। এখনও প্রতি বছর, ২ লক্ষেরও বেশি পর্যটক প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগের উদ্দেশ্যে এখানে এসে জমায়েত হন।

প্রশ্ন

(১) আফগানিস্থানের পার্লামেন্টের নাম কী ? **কৌশিক সিনহা,** ঝাড়গ্রাম ।
(২) ইরাকের বর্তমান প্রেসিডেন্টের নাম কী ? **রাজু ও সুরজিৎ পাল,** কোচবিহার ।
(৩) কোন বন্দরকে ভারতের প্রবেশদ্বার বলে ? **ঊর্মিতা মাইতি,** ঝাড়গ্রাম ।
(৪) 'মহাভারত' টিভি সিরিয়ালে কর্ণের ভূমিকায় কে অভিনয় করেছেন ? **দীপঙ্কর সিংহরায়,** কৃষ্ণনগর, নদীয়া ।
(৫) কোন ভারতীয় ক্রিকেটারের ডাক-নাম চিকা ? **সুব্রত সরকার,** সি· এম· এস· স্কুল বর্ধমান ।
(৬) ওয়েস্ট ইন্ডিজের উইকেটরক্ষক দুঁজোর সম্পূর্ণ নাম কী ? **নন্দদুলাল শুঁই,** নদীয়া ।
(৭) স্বাধীনতা-আন্দোলনে কোন মহিলা প্রথম শহিদ হয়েছিলেন ? **সন্দীপ সেনগুপ্ত,** বরানগর, কলকাতা-৩৬ ।
(৮) 'ডটার অব দ্য ইস্ট' কার আত্মজীবনী ? **রুমা রায়চৌধুরী,** মণিমালা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, আসানসোল ।
(৯) আমেরিকার জাতীয় খেলা কী ? **দেবর্ষি মুখার্জি,** পাঠভবন, শান্তিনিকেতন ।
(১০) কোন বাঙালি প্রথম 'নাইট' উপাধি লাভ করেছিলেন ? **কিংশুক গুপ্ত,** ঝাড়গ্রাম ।
(১১) নেলসন ম্যান্ডেলা যে বিমানে বারাণসী থেকে কলকাতা এসেছিলেন, সেই বিমানের নাম কী ? **অনীক সাঁই ও তপতী হাজরা,** পাল্লা রোড, বর্ধমান ।
(১২) টেস্ট ক্রিকেটে ইমরান খানের ৩৫০তম শিকার কে ? **অঞ্জন মণ্ডল,** বসিরহাট, উত্তর ২৪ পরগনা ।
(১৩) ক্রিকেট-বলের ওজন কত ? **কৌশিক তপাদার ও কল্যাণ বণিক,** সোদপুর, উত্তর ২৪ পরগনা ।
(১৪) ইডেন গার্ডেন্স কবে নির্মিত হয়েছিল ? **রানা বসু,** জুলিয়ান ডে স্কুল ।
(১৫) 'পঞ্চম বেদ' কাকে বলে ? **তনুশ্রী চক্রবর্তী,** আগরপাড়া, উত্তর

নিল ও'ব্রায়েন

২৪ পরগনা ।
(১৬) মহাকাশে প্রথম শহিদ কে ? **বাপ্পাদিত্য চক্রবর্তী,** ধুপগুড়ি, জলপাইগুড়ি ।
(১৭) কোন দেশের নাম ও তাদের মুদ্রার নাম এক ? **প্রদীপকুমার দাস,** কলকাতা-৬৫ ।
(১৮) 'বজ' কার ছদ্মনাম ? **শান্তনু ঘোষ,** ইলছোবা মণ্ডলাই হাই স্কুল, পাণ্ডুয়া ।

(উত্তর আগামী সংখ্যায়)

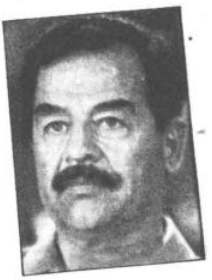

গত সংখ্যার উত্তর

(১) সম্রাট আলেকজান্দার দ্য গ্রেট ।
(২) ১-৬২ আউন্স ।
(৩) আওয়ার আমেরিকান কাজিনস ।
(৪) আলবেয়ার কাম্যু ।
(৫) ভ্যাটিকান সিটি ।
(৬) ভারত ।
(৭) তিনটি দ্বীপই নেপোলিয়নের জীবনের সঙ্গে জড়িত । নেপোলিয়ন জন্মেছিলেন কর্সিকায়, এলবা দ্বীপে কাটিয়েছিলেন বন্দিদশা, মারা গিয়েছিলেন সেন্ট হেলেনায় ।
(৮) পাকিস্তানের মুস্তাক মহম্মদ ।
(৯) উলুক ।
(১০) কোবি ।
(১১) অস্ট্রেলিয়ার স্টিভ ওয়াগ ।
(১২) রবিশঙ্কর ।
(১৩) পঙ্কজ রায় ও প্রণব রায় ।
(১৪) মোদি কন্টিনেন্টাল (মোদি টায়ার) ।
(১৫) দাইচি-ক্যাঙ্গিও । এটিও একটি জাপানি ব্যাঙ্ক ।
(১৬) জানা যায় না । কোনান ডয়েল কখনও ওয়াটসনের সম্পূর্ণ নাম লেখেননি ।
(১৭) সিমলা শহরে, ১৯১৩ সালে ।

রবিশঙ্কর

মুস্তাক মহম্মদ

আলবেয়ার কাম্যু

আলেকজান্দার দ্য গ্রেট

বিষয় : ভিনসেন্ট ভ্যান গঘ

প্রশ্ন

(১) ১৯৯০ সালে প্রখ্যাত চিত্রকর ভিনসেন্ট ভ্যান গঘের মৃত্যুশতবার্ষিকী। কীভাবে মারা গিয়েছিলেন ভ্যান গঘ ?

(২) ভ্যান গঘের জীবনী নিয়ে লেখা হয়েছিল পৃথিবীবিখ্যাত উপন্যাস 'লাস্ট ফর লাইফ' (জীবনতৃষ্ণা)। কে লিখেছিলেন এই উপন্যাস ?

(৩) ডাচ ভাষায় ভ্যান গঘ নামের উচ্চারণ কী ?

(৪) শিল্পকলার ইতিহাসে ভ্যান গঘের নামের সঙ্গে 'এক্সপ্রেশিনিজম' শব্দটি জড়িয়ে আছে। কে প্রথম এই শব্দটি চালু করেছিলেন ?

(৫) 'এক্সপ্রেশনিজম'-এর শিল্পকলা অন্য এক ধারার শিল্পচর্চার বিরোধিতা করে গড়ে উঠেছিল। সেই বিরুদ্ধ ধারার শিল্পচর্চাও ছবির ইতিহাসে বিখ্যাত। সেই ধারাটির নাম কী ?

(৬) ভ্যান গঘ কোথায় জন্মেছিলেন ?

(৭) কবে জন্মেছিলেন ভ্যান গঘ ?

(৮) ভ্যান গঘের জীবনে তাঁর ছোট ভাইয়ের অবদান ভীষণভাবে উল্লেখযোগ্য। ভ্যান গঘের চেয়ে বয়সে চার বছরের ছোট এই ভাই সুখে-দুঃখে, আপদে-বিপদে সবসময় দাদার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন ; ভ্যান গঘের আত্মহত্যার ছ' মাস পরে তাঁরও মৃত্যু হয়। ভ্যান গঘের এই ভাইয়ের নাম কী ?

কনফিল্ড অ্যান্ড সাইপ্রেসেস

(৯) ভ্যান গঘের বাবা ছিলেন একজন মন্ত্রী ; কাকা ছিলেন শিল্প-সংগ্রাহক। ভ্যান গঘের ষোলো বছর বয়সে এই কাকাই তাঁকে এক আর্ট-গ্যালারিতে চাকরির সুযোগ করে দিয়েছিলেন। ভ্যান গঘের জীবনে সেটাই প্রথম চাকরি। সেই আর্ট-গ্যালারিটির নাম কী ?

(ক)

(খ)

(গ)

(ঘ)

প্রশ্ন

(ক) ভিনসেন্ট ভ্যানগঘের বাবা। এঁর নাম কী ?

(খ) ভ্যান গঘের বিখ্যাত এক সেলফ পোর্ট্রেট। ছবিটির বৈশিষ্ট্য কী ?

(গ) অভার্স শহরের বিখ্যাত এক কাফে। কেন এটি বিখ্যাত ?

(ঘ) ভ্যান গঘের এই বিখ্যাত ছবিটির নাম কী ?

ছবির পরিচয় : (ক) থিওডোরাস ভ্যান গঘ। (খ) নিজের কান নিজে কেটে ফেলার পর ভ্যান গঘ এই ছবি এঁকেছিলেন। (গ) এই বাড়িতেই কেটেছিল ভ্যান গঘের জীবনের শেষ কয়েকটা দিন। (ঘ) সানফ্লাওয়ার।

(১০) ১৯৮৮ সালের ১৩ ডিসেম্বর হল্যান্ডের ক্রোলার-মুয়েলার মিউজিয়াম থেকে তেলরঙে আঁকা, ভ্যান গঘের একটি পৃথিবীবিখ্যাত ছবি চুরি হয়ে গিয়েছিল। পরে সেটি উদ্ধার করা হয়। কোন ছবি ?

(১১) এখন পর্যন্ত পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি দামে কোন ছবি বিক্রি হয়েছে ?

(১২) ভ্যান গঘের কান সবসময় ভোঁ-ভোঁ করত, প্রচুর ছবি এঁকেও মানসিক অবসাদগ্রস্ত, খিটখিটে হয়ে গিয়েছিলেন। শেষে নিজে থেকেই এক পাগলা-গারদে চলে যান। হার্ভার্ড মেডিক্যাল স্কুলে স্নায়ুরোগ বিভাগের বর্তমান প্রধান ডাঃ শারাম ঘোসবিন অনেক গবেষণা করে ভ্যান গঘের এই রোগটির কারণ জানতে পেরেছেন। কী সেই কারণ ?

(১৩) অস্ট্রেলিয়ান ব্যবসায়ী অ্যালান বন্ড এই বছরের ১১ এপ্রিল বিশ্বের শিল্পসংগ্রাহকদের কাছে রীতিমত বিখ্যাত হয়ে উঠেছিলেন। কেন ?

উত্তর :(১) ১৮৯০ সালের ২৭ জুলাই পিস্তলের গুলিতে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন ভ্যান গঘ। এই আঘাতেই, দু' দিন পর,২৯ জুলাই তাঁর মৃত্যু হয়। (২) আর্ভিং স্টোন। (৩) ভ্যান গো। (৪) জার্মানির 'ডার স্টুর্ম' পত্রিকার প্রকাশক, সে-যুগের বিখ্যাত শিল্পকলা-সমালোচক হেরওয়ার্থ ওয়াল্ডেন। (৫) ইম্প্রেশনিজম। (৬) হল্যান্ডের ব্রাবান্ত প্রদেশে গ্রুত-জুন্দার্ত গ্রামে। (৭) ১৮৫৩ সালের ৩০ মার্চ। (৮) থিও। (৯) গুপিল গ্যালারি। এটি হেগ শহরে অবস্থিত ছিল। (১০) আলুভোজী (দ্য পটেটো ইটার্স)। (১১) ভ্যান গঘের আঁকা 'সূর্যমুখী' (সানফ্লাওয়ার্স) নামের ছবিটি। লন্ডনে, ক্রিস্টির নিলামে এই ছবির দাম উঠেছিল চব্বিশ লক্ষ পঁচাত্তর হাজার পাউন্ড। (১২) ভ্যান গঘের মস্তিষ্কের 'টেম্পোরাল লোব' অংশটি কোনও না কোনওভাবে খারাপ ছিল। কানে শোনা, স্মৃতি ও অন্যান্য অনেক মানসিক কাজের জন্য মস্তিষ্কের এই অঞ্চল দায়ী। (১৩) প্রায় ৫৩ লক্ষ ডলার খরচ করে ভ্যান গঘের 'আইরিসেস' ছবিটি কিনেছিলেন অ্যালান। এই দামটি 'সূর্যমুখী'র চেয়েও বেশি।

কথা-বলা গোরিলা

বইটির নাম 'উইথ লাভ ফ্রম কোকো' । ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকায় একটি গোরিলাকে বিজ্ঞানীরা বহু কষ্ট করে 'সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ' বা 'সাঙ্কেতিক ভাষা' শেখান—যাতে সেই ভাষার সাহায্যে আকারে-ইঙ্গিতে কথা বলতে পারে সেই গোরিলা । এর ফলে জন্তু-জানোয়ারের জীবনের অনেক অজ্ঞাত তথ্য জানা যাবে । সেই গোরিলার নাম কোকো । বইটির লেখিকা অ্যানি ক্যানন কোকোর কাছে গিয়ে কী-কী অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছিলেন তারই বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে বইটিতে । ঝরঝরে ভাষা, মজার-মজার ঘটনায় ঠাসা বইটি । গোরিলা কোকো কত কিছু জানাতে চেয়েছে, বোঝাতে চেয়েছে, তার কথা রয়েছে বইটিতে । খুব চমকপ্রদ কোনও আবিষ্কার অবশ্য করা যায়নি, কেননা বহু বছরের পরিশ্রমেও কোকোকে দু'শোর বেশি শব্দ শেখানো যায়নি । তবে, ছোটদের বইটি ভাল লাগবে, জীবজন্তুদের ভালবাসতে শিখবে তারা ।
বইটির প্রকাশক স্কলাসটিক সংস্থা । দাম : ১২·৯৫ ডলার । বইটির ছবি এঁকেছেন কেথ ম্যাকনালটি । ছবিগুলিও মন কেড়ে নেয় ।

জোয়ান অব আর্ক

ইতিহাসের অনেক চরিত্রই যে শুধু জনপ্রিয় তাই নয়, এক-একটা দেশের মানুষ সেই চরিত্রদের করে তুলেছে আপন সংস্কৃতি, চিন্তা-চেতনা আর সাধারণ জীবনের অঙ্গ । জোয়ান অব আর্ক ফরাসি দেশের তেমনই এক মহিলার নাম । তাঁর জীবন ও দেশসেবা, ষড়যন্ত্রকারীদের হাতে ডাইনি অপবাদে তাঁর মৃত্যু, সবই আজ ফরাসি দেশের সর্বত্র আলোচিত হয় ।
জোয়ান অব আর্কের জীবন ও কর্ম নিয়ে চমৎকার একটি বই প্রকাশিত হয়েছে লিপিনকট প্রকাশন সংস্থা থেকে । নাম 'বিয়ন্ড দ্য মিথ, দ্য স্টোরি অব জোয়ান অব আর্ক' । লেখক পলি সোইয়ার ব্রুকস । লেখার গুণে ইতিহাসের তথ্য নিছক তথ্য আর সাল-তারিখ থাকেনি, পঞ্চদশ শতকের ফ্রান্স যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে চোখের সামনে । এক সাধারণ কৃষক পরিবার থেকে উঠে আসা এই মহিলা, কীভাবে ফ্রান্সের দুর্দিনে দেশকে, সারা দেশের মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন নবচেতনায়, তার ঐতিহাসিক বিবরণ লেখক বইটিতে সযত্নে সাজিয়ে তুলেছেন । রয়েছে ষড়যন্ত্রকারীদের তাঁকে পুড়িয়ে মারার চক্রান্ত বিষয়েও অনেক নতুন তথ্য । বইটির দাম ১৩·৯৫ ডলার । এক কথায় বইটি অবশ্যপাঠ্য ।

কচ্ছপের কাহিনী

এক ছিল কচ্ছপ । তার নাম আলফি । তাকে পুষেছিলেন মিস্টার হপি । কিন্তু সমস্যা দেখা দিল যখন আলফির বয়স এগারো বছর । মিস্টার হপি খুব চিন্তিত হয়ে পড়লেন আলফিকে নিয়ে । কেননা, এত বড় হয়েও আলফির ওজন মাত্র তিন আউন্স । আলফিকে বড় ভালবাসেন হপি । চিন্তায় তিনি মনে-মনে মুষড়ে পড়লেন । শেষে ওপরতলার মিসেস সিলভার দিলেন এক অব্যর্থ ওষুধ । প্রাচীন উপজাতিদের কাছ থেকে শেখা ম্যাজিক-ছড়া । সেই ছড়া মিসেস সিলভার শিখিয়ে দিলেন হপিবাবুকে । সেই ছড়া বলে খেতে দিলে নিশ্চিত বেড়ে উঠবে রোগা, দুর্বল আলফি । ছড়াটা এরকম :

এশিও ট্রট, এশিও ট্রট

তেগ রেগিব রেগিব
এমক নো, এশিও ট্রট...

ফল ফলল হাতেনাতে । তবে কিনা মুশকিলও হল অন্যদিকে । এত বড় হয়ে গেল কচ্ছপছানা যে, তার ঘরে তাকে আর আঁটে না, চৌবাচ্চায় ধরে না । তা হলে ? এবার তাকে একটু ছোট করে দেওয়া দরকার । আবার মিসেস সিলভারের কাছে ছুটলেন হপি ।

আলফিকে ছোট করে দেওয়া যাবে এমন কোনও ছড়া জানা আছে কি তাঁর ? সেইসব নিয়ে জমজমাট গল্প । লিখেছেন রোআল্‌ড ডাল । কুয়েনটিন ব্লেকের ছবিগুলিও তারিফ পাওয়ার যোগ্য । লেখক বলেছেন, জীবজন্তুদের মধ্যে পোষবার জন্য কচ্ছপই শ্রেষ্ঠ । তারা বেড়ালের মতো ছিঁচকাঁদুনে নয়, কুকুরের মতো বদমেজাজি নয়, টিয়াপাখির মতো বকবক করে না সর্বক্ষণ, তাদের শান্ত, ভদ্র জীবন খুবই প্রশংসনীয় । যদি এ কথায় কচ্ছপ পোষা চালু হয় তাই ম্যাজিক-ছড়াটিও শিখিয়ে রাখলাম ।
বইটির নাম এশিও ট্রট । প্রকাশক কেপ সংস্থা । দাম : ৬·৯৫ পাউন্ড ।

অভীক মজুমদার

নানারকম বই

রায়মঙ্গল
সম্পাদক : শৈলেন্দ্র হালদার
আশীর্বাদ প্রকাশন,
লেকটাউন, কলকাতা-৭০০ ০৮৯
দাম : ২৫ টাকা

সত্যজিৎ রায়ের জন্মদিন ২ মে । তাঁর জন্মদিনের কথা মনে রেখে ছড়া ও কবিতার এই সঙ্কলনের আয়োজন । কবিতায় সত্যজিৎ রায়ের প্রতি শ্রদ্ধার অর্ঘ্য রচনা করেছেন ছড়া ও কবিতার মাধ্যমে । এই সঙ্কলনের রচনাগুলির মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে সত্যজিৎবাবুর বিরল ও বহুমুখী প্রতিভার নন্দিত বর্ণনা । এই ধরনের সঙ্কলনের সব লেখাই গুণগত মানে উত্তীর্ণ হয় না । এই সঙ্কলনের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে । বিখ্যাত শিল্পীদের আঁকা ছবিগুলি অসাধারণ । সব মিলিয়ে 'রায়মঙ্গল' একটি সতন্ত্র সঙ্কলন, অনেকেই নিজস্ব সংগ্রহে রাখবেন ।

বুদ্ধিবিচার
অরূপরতন ভট্টাচার্য
দে'জ পাবলিশিং,
কলকাতা-৭০০ ০৭৩
দাম : ২০ টাকা

ছোটদের জ্ঞান ও বুদ্ধি বাড়বে—এমন বই বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হলে আমাদের ভাল লাগে । আমাদের দেশে ছোটদের জন্য যে-কোনও উদ্যোগেই কাপর্ণ্যের ছাপ চোখে পড়ে । এই বইটি হাতে নিয়ে মনে হয়, লেখক ছোটদের জন্য সত্যিই একটি সুন্দর উপহার তুলে দিয়েছেন । ১০টি করে প্রশ্নের এক-একটি বুদ্ধিবিচার প্রশ্নমালা রচনা করেছেন । এর মধ্যে অঙ্ক ও জ্যামিতির প্রশ্নও যেমন আছে, তেমনই আছে সাধারণ বুদ্ধির প্রশ্ন । এরকম ২৫টি প্রশ্নমালার এই বইটি ছোটদের অবসর সময়ের এক দারুণ সঙ্গী ।

রতনতনু ঘাটী

নানারকম

ধাঁধা

"আজ একটা অদ্ভুত জিনিস দেখলাম, অফিস থেকে ফেরার সময়।" চায়ের পেয়ালায় ঠোঁট ছুঁইয়ে টেবিলের ওপর কাপটা নামিয়ে রাখতে-রাখতে ছোট্‌কা বলল। এমনিতেই ফিরতে একটু

দেরি হয়েছে ছোট্‌কার। বলল, রাস্তায় নাকি দারুণ জ্যাম ছিল। শুধু শ্যামবাজারের মোড়টুকু পার হতেই আধ ঘণ্টা লেগেছে। তো, মিছিল আর জ্যাম কবে না থাকে কলকাতায়। সকাল বলো, দুপুর বলো, সন্ধে বলো—একটা-না-একটা লেগেই আছে। কিন্তু আজ যেন ছোট্‌কা জ্যাম ঠেলে এসেও ক্লান্ত বা বিরক্ত নয়। মুখে মিটিমিটি হাসি। তার উপর, চায়ের টেবিলে বসেই আমাদের ডেকে নিয়েছে। চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে তাই ছোট্‌কা যখন অদ্ভুত জিনিস দেখার কথা বলল, তখনই সন্দেহ হয়েছে, ছোট্‌কা একটা মজার গল্প কিছু শোনাবে। কিন্তু গল্প কোথায়! এ তো চমৎকার একটা ধাঁধা। জ্যামজট নিয়ে জট-পাকানো ধাঁধা। শুনবে গল্পটা.অর্থাৎ ধাঁধাটা? বেশ শোনো।

প্রথম ধাঁধা ॥ শ্যামবাজারের মোড়ে দারুণ জ্যাম। সব ক'টা রাস্তা

বন্ধ। বাসের পেছনে বাস, ট্রামের পেছনে ট্রাম, টেম্পো, মিনিবাস, প্রাইভেট গাড়ি, ট্যাক্সি সব একেবারে গায়ে-গায়ে লাগানো। কেউ কাউকে ওভারটেক করে এগোবে তার কোনও উপায় নেই। সামনে, পেছনে, পাশে, উলটো দিকে—কোথাও একতিল জায়গাও নেই। সেই নিশ্ছিদ্র জ্যামের মধ্যে আটকে-থাকা একটি গাড়ির আরোহী হঠাৎ লক্ষ করলেন যে, তাঁদেরই বাড়ির উলটো দিকে যে-ট্যাক্সি ড্রাইভারটি থাকে, সেই ট্যাক্সি ড্রাইভার সোজা ভূপেন বসু অ্যাভিনিউ থেকে এসে নেতাজির মূর্তি ডান হাতে রেখে যশোর রোডের দিকে চলে যাচ্ছে। দিব্যি চলে গেল। কীভাবে এটা সম্ভব হল, অনুমান করতে পারো? অথচ জ্যামজট পরিষ্কার হতে শুরু করেছে আরও কুড়ি মিনিট পরে।

দ্বিতীয় ধাঁধা ॥ দুটি পদবি পাশাপাশি রাখলেই এক বিখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী। কার কথা মনে পড়ছে?

তৃতীয় ধাঁধা ॥ কোন টেবিলের পায়া নেই?

গতবারের উত্তর ॥ (১) সাতাশটি নাড়ু ছিল। পলাশ খেয়েছে ন'টি। শোভন বাকি আঠারোটির মধ্যে ছ'টি। নাড়ু রইল বারোটি। অশোক এই বারোটির এক-তৃতীয়াংশ, অর্থাৎ চারটি নাড়ু খেয়েছে। মা এসে দেখলেন, আটটি নাড়ু বেঁচে গেছে। এবার এর থেকে শোভনের প্রাপ্য তিনটি নাড়ু, অশোকের পাঁচটি। (২) বাংলায় চার লিখে ইংরেজিতে লিখেছি ভাবলেই হল। তখনই চার হবে আট। (৩) ভাবপ্রবণতা।

সত্যসন্ধ

শব্দকথা

মামিমা, কাকিমা, মাসিমা, পিসিমা—এঁরা আমাদের আপন জন। এঁদের মধ্যে দুজনের কিন্তু এক জায়গায় দারুণ মিল। সেই দুজন কে কে এবং মিলটাই বা কী?

২। 'গণ্ড' মানে কপোল বা গাল। কিন্তু শব্দটির আরও অর্থ আছে যখন এটি অন্য শব্দের আগে বসে।

'গণ্ড'-সহযোগে তেমনই চারটি শব্দ বানাও তো সূত্র অনুযায়ী : (ক) বিশৃঙ্খলা। (খ) নিরেট বোকা। (গ) পাহাড়-পর্বত থেকে বিচ্যুত বৃহৎ শিলাখণ্ড। (ঘ) বর্ধিষ্ণু পল্লী।

৩। কোন ঘুড়ি ওড়ে না, চাকার সাহায্যে চলে?

উত্তর : ১। মামিমা ও মাসিমা— উলটো দিক থেকে ডাকলেও এঁরা একই থাকেন। ২। (ক) গণ্ডগোল। (খ) গণ্ডমূর্খ। (গ) গণ্ডশৈল। (ঘ) গণ্ডগ্রাম। ৩। চৌঘুড়ি, অর্থাৎ চার ঘোড়ায় টানা গাড়ি।

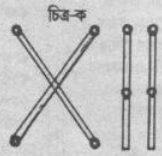

কথক

মজার খেলা

এবারের মজার খেলাটার নাম দেওয়া যাক, হিসেব-ভোলানো অঙ্ক।

এ-খেলার জন্য চাই আটটা পোড়া দেশলাইকাঠি কি আটটা সমান মাপের টুথপিক। কাঠি আটটাকে 'ক' চিহ্নিত ছবির মতো (ছবি মানে সংখ্যা) সাজিয়ে রাখো টেবিলের ওপর। দেখতে হবে, রোমান হরফে বারোর মতন।

এবার বন্ধুদের খুব নিরীহ মুখে প্রশ্ন করো, আচ্ছা, চট করে বলো তো, বারো থেকে চার বিয়োগ করলে কত হয়? খুব তাড়াতাড়ি বলতে হবে।

এ আর এমন কী, কঠিন প্রশ্ন। বন্ধুরা তাই তক্ষুনি জবাব দেবে, আট হয়। খুব বিরক্ত একটা মুখের ভঙ্গি করে বন্ধুদের বলো, এই সামান্য অঙ্কটারও উত্তর তোমরা কেউ ঠিকমতো দিতে

পারলে না! বন্ধুরা, দেখবে, তোমার এই জবাবে উত্তেজিত হয়ে পড়বে। বলবে, তোমারই মাথা খারাপ হয়ে গেছে। আর, তুমি তর্ক করে যাও—মাথা আমার খারাপ হয়নি। তোমাদেরই মাথা খারাপ। বারো থেকে চার বাদ দিলে সাত হয়। সাত। বুঝলে?

সাত! বন্ধুরা তো হতবাক হয়ে যাবে এ-উত্তর শুনে। কিন্তু তুমি তোমার কাজ চালিয়ে যাও। ছবিটা থেকে চটপট চারটে কাঠি সরিয়ে নিয়ে বন্ধুদের দেখাও, কীভাবে বারো থেকে চার বাদ গেলে পরিষ্কার সাত হচ্ছে টেবিলের ওপরে। 'খ' ছবিতে যেমন রয়েছে।

চিত্র-ক

চিত্র-খ

মজারু

ছবি : দেবাশিস দেব

সারা জগৎ যখন বলে

"প্রচণ্ড শীত পড়েছে..."

আপনার ত্বক তখন বলে

"কেন? বসন্ত তো এসেছে।"

নতুন তুহিনা উইন্টারগার্ড। উৎকৃষ্ট। কোমল। লেনোলিনে ভরপুর।
শীতের খসখসে ত্বক থেকে বাঁচবার এর থেকে ভাল উপায় আর কোথায়?

১০০ মি. লি. ও ২০০ মি. লি.-এ পাওয়া যাচ্ছে।

Karishma/SW/51/2719 BG

ANANDAMELA 28 NOVEMBER 1990 REGD.NO.
WB/CC/264 MH BY SOUTH 683 TN/MS(C) 731

সাদা কথা

আর সব ক্রীম ছেড়ে বোরো ক্যালেনডুলাই
বেছে নিলাম কেন? এতো সাদা কথা। পরখ
করলেই বুঝবেন এই টিউবে আছে সেরা
কোয়ালিটি'র ক্রীম। আছে চন্দন আর
ল্যানোলিন—সঙ্গে ক্যালেনডুলার গুণ।
শুকনো ত্বকে যেমন কাজ দেয়, মামুলি কাটা
ছড়াও তেমন চটপট সারায়। তাই না
বোরো ক্যালেনডুলা এত খাঁটি—এত সাদা।

ল্যানোলিন সমৃদ্ধ
খাঁটি সাদা
বোরো ক্যালেনডুলা*
অ্যান্টিসেপটিক ক্রীম

HL এর উৎকৃষ্ট উৎপাদন

* প্রসাধন সামগ্রী নয়

Mileage/90/51